প্রণয় আদিম

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
কলিকাতা-৭০০০০৯

Pranay Adim
(A Bengali Novel)
By—Ashutosh Mukhopadhyay

প্রথম প্রকাশঃ
নববর্ষ ১৩৭১

প্রকাশিকা ঃ
অপর্ণা জানা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক ঃ
ইউনাইটেড প্রিণ্টার্স
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

এক

হঠাৎ এ-রকম বে-কায়দায় পড়ে যাব কে জানত। চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে সোজা হাসপাতালে চালান করলাম নিজেকে। বিদেশে অসুস্থ হয়ে পড়লে মানুষ কত অসহায়, তার নজির আমি। বলা নেই কওয়া নেই ধুম জ্বর, সেই সঙ্গে বুকে ব্যথা অল্প অল্প।

অসুস্থতার হেতু সম্ভবত অনভ্যাসের জল-বাতাস। ঝুপঝুপ বৃষ্টি লেগেই আছে। যেদিকে তাকানো যায় সব জুড়ে সমারোহ। কাছে দূরে অনেক পাহাড়, অনেক জঙ্গল। কিন্তু ও-গুলোর যেন স্নানব্রত লেগেই আছে। আকাশ জল ঢালছেই, ও-গুলোরও স্নানের বিরাম নেই। স্থানীয় বাসিন্দারা এই জলবাতাসে অভ্যস্ত। আমি শুধু বে-কায়দায় পড়ে গেছি। জলের দরুণ আমার গায়ে অসময়ে শীত নেমে এসেছে।

আমার সঙ্গে একটা ছোট বেডিং আর একটা স্যুটকেস। তাই নিয়ে হোটেল থেকে যখন হাসপাতালে ঢুকলাম, একশ' চার জ্বর। বুকেও রীতিমতো ব্যথা।

ছোট হাসপাতাল! দুটো মাত্র কেবিন। আর প্রকাণ্ড দুটো হল-ঘরে জেনারেল ওয়ার্ড। একটা ছেলেদের—একটা মেয়েদের। সেই দুটো ওয়ার্ডের সারি সারি বেড-এ রোগীর গাদা।

সেখানকার একজন তরুণ ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করেই ওই জেনারেল ওয়ার্ডের একটা বেড-এ চালান করে দিল। সেই দিনটা তেমন হুঁস ছিল না। পরদিন সকালের দিকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিলাম। গত সন্ধ্যার মধ্যে ওষুধ ছাড়া দুটো ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। সেই তরুণ ডাক্তার সকালেও একটা ইনজেকশন দিতে এলো। শুনলাম, নিউমোনিয়ার চিকিৎসা শুরু হয়েছে, বুকের দুদিকেই ব্রংকিয়াল প্যাচ জমাট বেঁধেছে—খুব সময়ে আমি হাসপাতালে

এসেছি। ডাক্তারের মতে নিউমোনিয়া হলেও নিশ্চিন্ত হবার জন্য ব্লাড, স্পুটাম এবং একস্-রে অবশ্যই করিয়ে নেওয়া দরকার। আর তিন সপ্তাহের আগে ট্রেন জার্নির অর্থাৎ দেশে ফেরার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

এইবার আমি প্রমাদ গুণলাম। আটকে গেলাম বলে নয়, এখানে তিন সপ্তাহ থেকে চিকিৎসা করাতে হলে যে সমস্যা তার নাম অর্থ-সঙ্কট। এই জেনারেল ওয়ার্ডের এত বিভিন্ন রোগ আর রোগীর মধ্যে থাকতে হলে তাইতেই অবস্থা কাহিল হয়ে দাঁড়াবে। ওদিকে স্যুটকেসে বড়জোর, শ'-দুই টাকা আছে। এখানে আসার আমার কোনো প্রোগ্রাম ছিল না। ইউ. পি-র নানা জায়গা ঘুরে ফেরার আগে হঠাৎ মনে হল মধ্যপ্রদেশের ওই নামী জায়গাটা দেখা হয়নি, একবার ঘুরে যাই। তখনো শ'-আড়াই টাকা ছিল সঙ্গে, তিন-চার দিন ঘুরে চলে যাব, কত আর লাগবে?

তার মধ্যে এই বিপত্তি।

সেই ডাক্তারের কাছে সরাসরি সঙ্কটের প্রসঙ্গ ব্যক্ত করলাম। টাকা-কড়ি সঙ্গে বেশি নেই, অথচ তিন সপ্তাহে এই জেনারেল ওয়ার্ডেও আমার থাকা সম্ভব নয়। তার কারণ, চোখের সামনে এত রোগী দেখলে এমনিতেই অসুস্থ বোধ করি। আমাকে আজই একটা কেবিনে নেবার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম মনি অর্ডারে টাকা আনা যেতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে বাড়ি থেকে তাহলে লোকও ছুটে আসবে। সেটা চাই না। একমাত্র পথ স্পেসিমেন সিগনেচারসহ আমার ব্যাঙ্কে চিঠি লেখা। সে-চিঠি পেলেই তারা টাকা পাঠাবে, কিন্তু তাতে হয়ত পাঁচ-সাতদিন লাগবে। ইতিমধ্যে একস-রে-টেকস-রেগুলো হয়ে যাক, সঙ্গে যে টাকা আছে তাতেই কুলিয়ে যাবে—ইতিমধ্যে আজই আমাকে অনুগ্রহ করে কেবিনে সরানো হোক।

দুর্বলতাবশত নিজের পরিচয়ও দিলাম এই সঙ্গে। কিন্তু অবাঙালী

ডাক্তারের বাংলাদেশের লেখক প্রসঙ্গে বাড়তি কোনরকম আগ্রহ বা কোমলতা দেখা গেল না। নির্লিপ্ত সৌজন্যের সুরে জবাব দিল, এ-রকম ব্যবস্থা করাটা তার একতিয়ার নয়, এটা শহর উপকণ্ঠের বে-সরকারী হাসপাতাল, ম্যানেজমেণ্টের যিনি প্রধান এ-ব্যবস্থা তাঁর অনুমোদনসাপেক্ষ—তিনি বিকেলে আসেন ভালো, নইলে টেলিফোনে আমার বক্তব্য তাঁকে জানানো হবে।

ভিতরে ভিতরে ক্ষুণ্ণ হয়ে আমি বললাম, তাঁকে এও জানাবেন, তাঁর অমত হলে এই অবস্থায় আমাকে কলকাতা রওনা হতে হবে।

দুপুরের মধ্যে নার্সের সঙ্গে একটু বাক্যালাপের সুযোগ হয়েছিল। তার মুখে শুনলাম, ম্যানেজমেণ্টের ওই প্রধানটির নাম মিস্টার আরডে—সকলে শংকরজী বলে তাঁকে, অর্থাৎ নাম শংকর। বলতে গেলে তাঁরই টাকা আর উদ্যোগে এই 'মাতিলদা' হাসপাতাল। বাইরের টাকাকড়ি এবং সাহায্য এই ভদ্রলোকের চেষ্টাতেই সংগ্রহ হয়েছে এবং হচ্ছে। শংকরজী লোক খুব ভালো, কিন্তু মানুষটা কড়া খুব, নিয়মের বাইরে কাউকে কোন সুবিধে দেবার লোক নন। নার্সের কথায় যা বুঝলাম, লোকটিকে সকলে সমীহ করে এবং ভয়ও করে। প্রায় প্রতি বিকেলেই তিনি হাসপাতালে এসে থাকেন। না এলে টেলিফোনে খবর নেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

বাড়তি সুযোগ-সুবিধের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। গতকাল থেকে আজ একটু ভালো আছি, কোন রকম সুবিধে না হলে আগামীকাল রওনাই হয়ে পড়ব, তারপর যা থাকে কপালে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি ডাক্তার?

নার্স মাথা নাড়ল, ডাক্তার নয়। কি যে, তাও কেউ জানে না।

শুনেছিলাম বিকেল পাঁচটা নাগাদ আসেন তিনি। চারটের সময় সেই তরুণ ডাক্তারটি ঈষৎ ব্যস্ত মুখে আমাকে জানিয়ে গেল,

মিস্টার আরডের সঙ্গে তার কথা হয়েছে, তিনি আসছেন জানিয়েছেন।

জ্বরটা আবার বাড়ছে হয়ত, আমি সে-রকম উৎসাহ বোধ করলাম না।

মিনিট-পনেরর মধ্যে যে লম্বা-চওড়া লোকটি ওয়ার্ড-হল-এ ঢুকলেন, এক নজর তাকিয়েই বুঝলাম তিনিই মিস্টার আরডে, অর্থাৎ শংকরজী। তাঁর একপাশে সেই ডাক্তার, অন্য পাশে মেট্রন, পিছনে নার্স। ব্যস্ত-সমস্ত হাবভাব সকলেরই।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ভদ্রলোক সোজা আমার বেড-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাথা নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন?

জবাবে একটু হেসে দু'হাত তুলে আমি নমস্কার করতে গেলাম। তিনি বাধা দিয়ে উঠলেন, ডোণ্ট মুভ প্লীজ। আমার নাম আরডে, আপনি শুনলাম মিস্টার মুখার্জি—পুরো নাম কি?

বললাম।

তিনি চেয়ে রইলেন একটু। নাম শুনে প্রীত হবার কারণ নেই। ভদ্রলোক কড়া মানুষ শুনেছি, কিন্তু হাসিটুকু মিষ্টি। আর দেখলেই মনে হয় সবল পুরুষ। সবল মানুষের মুখের হাসি সকলেরই সুন্দর মনে হয়। আমারও ভালই লাগল।

বলতে গেলাম, আমার একটা আর্জি ছিল মিস্টার আরডে—

—শুনেছি। ডোণ্ট ওয়ারি—

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে গেলেন। ফলে সুব্যবস্থাই আশা করলাম।

তারপর প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে তাঁর অথবা ডাক্তারের কোন পাত্তা নেই। আমি এই জেনারেল ওয়ার্ডেই পড়ে আছি। তফাতের মধ্যে নার্স আর মেট্রন ঘন ঘন এসে আমার খবর নিয়ে যাচ্ছে। ওদের চোখে হঠাৎ আমি বিশিষ্ট রোগী হয়ে উঠেছি।

অন্য অন্য বেড থেকে তাই রোগীরা কুত-কুত করে আমাকে দেখছে।

নার্সকে জিজ্ঞাসা করলাম, ডাক্তার কোথায়?

নার্স সসম্ভ্রমে জবাব দিল, ডাক্তার মিস্টার আরডের ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে কথা কইছেন।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে এক নতুন মুখের পদার্পণে ওয়ার্ডে আবার একটা ব্যস্তসমস্ত তৎপরতা দেখা গেল। বেঁটে-খাটো আগন্তুককে সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন মিস্টার আরডে। তাঁদের পিছনে ডাক্তার, মেট্রন, নার্স।

বুঝলাম ইনি বড় ডাক্তার হবেন কেউ। আমাকে খুঁটিয়ে-পরীক্ষা করলেন। তারপর চার্ট দেখলেন, ব্যবস্থা-পত্র শুনলেন। তারপর ওদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে দরজার দিকে এগোলেন। লক্ষ্য করলাম, বড় ডাক্তারটি মিস্টার আরডের কোনো কথায় সায় দিতে দিতে এগোচ্ছেন।

এর পরেই আমার সত্যিকারের অবাক হবার পালা।

মেট্রনের নির্দেশে দুটো লোক আমার স্যুটকেস আর বেডিংটা নিয়ে চলল কোথায়। তারপরেই দেখি পাশে হুইল স্ট্রেচার নিয়ে দুটো লোক হাজির। মেট্রন আর নার্সের সাহায্যে আমাকে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে চলল তারা।

তখনো আমার ধারণা কেবিনে যাচ্ছি।

কিন্তু আমাকে একেবারে বাইরে আনা হল, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামানো হল। তারপর এ-কি কাণ্ড! সামনে ছোট একটা লাল-ক্রস মার্কা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি। জিজ্ঞাসাবাদেরও সুযোগ নেই, সোজা অ্যাম্বুলেন্স-এ তুলে ফেলা হল আমাকে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ি চলল।

আমি বিস্ময়ে আর শঙ্কায় হাবুডুবু। কোথায় নিয়ে চলেছে আমাকে, আসল শহরের বড় কোনো হাসপাতালে? বড় ডাক্তার এসে কি দেখল? কি পেল?

মিনিট পনেরর মধ্যে গাড়ির গতি কমল। চাকার শব্দে মনে হল পাথর কুচির ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে গাড়িটা। একটু বাদে থেমে গেল। দরজা খোলা হতে দেখলাম একটা বাংলোর সামনে এসে থেমেছে ওটা। তিন চারজন লোক স্ট্রেচারে করে আমাকে এনে সেই বাংলোর একটা মস্ত ঘরের শয্যায় এনে শুইয়ে দিল। স্ট্রেচার বাহকদের ওই ঘরের ওই শয্যায় আমাকে আনার নির্দেশ মিস্টার আরডে দিয়েছেন। তিনি আমার আগে আগে ওই ঘরে ঢুকেছেন। তাঁর পাশে হাসপাতালের সেই তরুণ ডাক্তার।

আমাকে ঠিক মতো স্থিতি করে আরডে সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাসি মুখে অন্তরঙ্গ সুরে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, খারাপ লাগছে ?

আমি বিস্মিত চোখে তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নাড়লাম। খারাপ লাগছে না।

ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করলেন একটু। তারপর আরডের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘর ছেড়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। খানিক বাদে দেখলাম, হাসপাতালের যে অল্প বয়সী নার্সটির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল সে হাজির। হাসিমুখে সে আমাকে একদফা অভিবাদন জানালো। বলল, এই সব থেকে ভালো ব্যবস্থা হয়েছে।

নিঃসংশয়ে এরা আমাকে ভারী গণ্যমান্য পেসেণ্ট ধরে নিয়েছে। আমার অস্বস্তি লাগছে। বলে ফেললাম, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এ কোথায় এলাম ?

প্রশ্ন শুনে নার্সও অবাক একটু। সে কি এটা তো মিস্টার আরডের বাড়ি। এ তাঁরই শোবার ঘর। এ ঘরে আলো-বাতাস সব থেকে বেশি বলেই বোধহয় আপনাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

শুনলাম আরডে আবার হাসপাতালে চলে গেছেন কিছু দরকারী

কাগজপত্র দেখতে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরবেন। হাসপাতালে যিনি দেখে গেলেন আমাকে তিনি বড় ডাক্তার এখানকার। আরডে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন, পেসেণ্টকে তাঁর বাড়িতে এনে রেখে চিকিৎসা করা যেতে পারে কিনা। তিনি বলেছেন, স্বচ্ছন্দে, ভয় পাবার মতো কিছুই হয়নি। কমপ্লিকেশন কিছু না দেখা দিলে সেরে উঠতে পনের দিনও লাগার কথা নয়। আরডে তখন নিশ্চিত হয়ে আমাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করেছেন। রাত্রিতে এই নার্স আমাকে অ্যাটেণ্ড করবে, সকালে অন্য নার্স আসবে।

ভিতরে ভিতরে বিড়ম্বনার একশেষ আমার। হাসি মুখেই ঈষৎ অনুযোগের সুরে নার্স আবার বলল, মিস্টার আরডের আপনি এমন অন্তরঙ্গ একজন, সে কথা কিন্তু হাসপাতালে একবারও বলেন নি।

সত্যি কথাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বললাম, আমি তাঁকে জীবনে এই প্রথম দেখছি, আর তাঁর নামও এই প্রথম শুনলাম।

এবারে নার্সের অবাক হবার পালা। তারপর কিছু যেন মনে পড়ল তার। বলল, আপনি একজন লেখক শুনেছিলাম, বোধহয় সেই জন্যে—

—লেখকদের উনি খুব ভালবাসেন?

—উনি সকলকেই ভালবাসেন। আমাদের ধারণা, ভয়ানক খামখেয়ালী মানুষ হলেও উনি ভিতরে ভিতরে শিল্পী একজন, তাই বোধহয় আপনাদের বেশি পছন্দ করেন। সেবারে আপনাদের বাংলা দেশের এক নামকরা গায়ক এসেছিলেন, মিস্টার আরডে তাঁকে সাতদিন নিজের বাড়িতে ধরে রেখেছিলেন।

যত আরামের ব্যবস্থাই হোক, রুগ্ন অবস্থায় এ-ভাবে এক অপরিচিতের শয়ন ঘর দখল করে বসার অস্বস্তি লেগেই থাকল। বললাম, আমার ভয়ানক খারাপ লাগছে, হাসপাতালের কেবিনেই

অনায়াসে থাকতে পারতুম……তাছাড়া সমস্ত দিনের ডিউটির পর আপনার আবার রাত্রিতে থাকা—

মেয়েটি সরল গোছেরই বটে, বলে ফেলল, আমি তো এ-জন্যে ডবল টাকা পাব, আর সে টাকাও রিজার্ভ ফাণ্ড থেকে দেওয়া হবে, সে জন্য আপনার কিছু ভাবতে হবে না।

শংকর আরড়ে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। একটা চেয়ার সামনে টেনে নিয়ে বসে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনরকম অসুবিধে হচ্ছে না?

জবাব দিলাম, এত সুবিধে হচ্ছে যে তাইতেই লজ্জা পাচ্ছি, মিছিমিছি এ-রকম—

ব্যাস ব্যাস, আপনার একটুও লজ্জা পেয়ে কাজ নেই, দিস ইজ মাই প্রাউড প্রিভিলেজ, এই ঘরে বসেই আপনি জব্বলপুরের পাহাড় জঙ্গল আর বৃষ্টি দেখতে পাবেন, কিন্তু বেশি দেখতে গিয়ে আবার ঠাণ্ডা লাগাবেন না, ডাক্তারের ব্যবস্থা মতো বাবুর্চি আপনার খাবার তৈরী করে দেবে, আর সে দু'বেলা আপনাকে দেখে যাবে, ব্লাড একস্-রে টেকস্-রে যা করা দরকার সব এখান থেকেই হবে, আমাদের সব থেকে ব্রাইট আর ইয়ং নার্স এই সোহনিকে আপনার সেবায় লাগিয়ে দিয়েছি, এর পরেও এখানকার লোক অতিথিপরায়ণ নয় এ-কথা আপনি বলতে পারেন না। দরাজ গলায় হেসে উঠলেন।

নার্স সোহনিও লজ্জা পেয়ে হাসতে লাগল। আরড়ে তাকে হুকুম করলেন, আমাদের চায়ের ব্যবস্থা দেখো, এখানে তো আর হাসপাতালের নার্স নও, প্লে এ গুড হোস্টেস্—

সে চলে যেতে বলল, আমার গৃহিণীশূন্য গৃহ মশাই আপনার অসুবিধে হবে।

কোনো মানুষকে দু'দণ্ডের মধ্যে এত ভালো লাগতে পারে জানতাম না। ভদ্রলোকের বয়স ষাট হবে, কাঁচা-পাকা চুলে বোঝাই

মাথা। গৃহীণী ছিলই না, না এখন নেই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। করা গেল না।

তিনি উৎসুক নেত্রে তাকালেন আমার দিকে। —আপনার কত বই আছে।

বললাম। উনি শুনেই খুশি। বললেন, তাহলে হিন্দিতে মাত্র তিন-চারখানার অনুবাদ হল কেন? আমি তো বাংলা জানি না, ওই ক'টা মাত্র পড়েছি। তাছাড়া আপনার হিন্দী বাংলা ছবিও কিছু দেখেছি। আপনার গল্প আমার ভালো লাগে কেন জানেন? ট্রাজেডি হোক বা কমেডি হোক, ভালবাসার প্রতি আপনার কিছু বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা আছে।

শুনলে কোন্ লেখকের না ভাল লাগে। এরই মধ্যে আমার রোগ-যন্ত্রণা যেন সেরেই গেছে। বললাম, কিন্তু ও-বস্তুটি সত্যি আছে কি?

ভদ্রলোক অবাক যেন একটু। জিজ্ঞাসা করলেন, না থাকলে লেখেন কি করে?

জবাব দিলাম, আছে ভাবতে ভালো লাগে তাই লিখি।

—তার মানেই আছে। তিনি হাসতে লাগলেন। বললেন, কিন্তু এখন আর কোনো কথা নয়, দুর্বল শরীর, অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা হচ্ছে—চা খেয়েই শুয়ে পড়ুন।

শংকর আরডের অন্তরঙ্গ যত্নের ঠেলায় দিন দশেকের মধ্যেই চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। আমাকে ছেড়ে দিলে অনায়াসে এখন দেশে রওনা হতে পারি। কিন্তু তিন সপ্তাহের আগে ছাড়া পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। শংকর আরডে সে-কথা জোর গলায় বার বার ঘোষণা করেছেন। বলেছেন, পালাতে চাইলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব, আমাকে চেনো না।

বয়সে আমার থেকে বছর দশেকের বড় উনি, কিন্তু এরই মধ্যে অনায়াসে দু'জনেই আমরা আপনি থেকে তুমিতে চলে এসেছি। এখান থেকে তিন সপ্তাহের আগে আমারও যাবার তাড়া আদৌ নেই এখন। বলতে হয় বলেই দুই একবার বলেছি।

ভদ্রলোক খুব কথা বলেন, আর সব কথাই খুব রসিয়ে বলতে পারেন। এমন হাসিখুশি মানুষ কমই দেখা যায়। কিন্তু খুব ভোরে এই মানুষেরই গম্ভীর সমাহিত মূর্তি দেখেছি আমি। অনেকটা জমির ভিতর এই বাংলো। মাঝখানে বড়সড় বাগান। থরে থরে ফুল ফুটে আছে। একটা মালী প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত বাগানে কাজ করে। অবসর সময়ে বাংলোর মালিককেও বাগানে হাত লাগাতে দেখি। বাগানের দু'দিকের লাল পাথর কুচির রাস্তা ওটাকে গোল হয়ে ঘিরে আবার গেটের দিকে এক হয়ে মিশেছে। শংকর আরভে খুব সকালে ওঠেন। বাগানে বেড়ান। বাগান থেকে, বাগান থেকে কেন, এই ঘরে বসেও দেখা যায়, পশ্চিমের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বেলে পাথরের বিন্ধ্যপর্বত। অন্যান্য দিকেও পাহাড় আছে, আরভে কোনটা কোন পাহাড় আমাকে চিনিয়ে দিয়েছেন। দক্ষিণের ওই ওটা মহাদেও পর্বত, বিন্ধ্যর ওদিকটার নাম ভানর রেঞ্জ—উত্তর পূর্বের ওই ওটা কহেনজুয়া হিল্‌স। আর ওই যে দূরে পাহাড়ী জঙ্গল দেখছ, ওর ওধারে নর্মদা—নর্মদার এদিককার ব্রাঞ্চের নাম হিরণ, নদী না বলে ওটাকে পাহাড়ী নালা বলতে পারো এখন। সকালে দূরের ওই পাহাড় আর বনভূমির দিকে তাকিয়ে নিশ্চল মূর্তির মতই এক একদিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি তাঁকে। এই উচ্ছল হাসি-খুশি মুখেরই সমাহিত মূর্তি তখন। তার কাছে এসেও মনে হয়েছে, হুঁস নেই যেন।

আমার গোড়া থেকেই মনে হয়েছে, ভদ্রলোকের জীবনে নারী-ঘটিত কোনো ব্যাপার আছে। ভদ্রলোক মনের মধ্যে কারো স্মৃতি পুষেছেন। সেটা বেদনার কি আনন্দের জানি না, কিন্তু কেন যেন

আনন্দের মনে হয় না আমার। আমার এ-রকম অনুমানের প্রত্যক্ষ কারণ গোটাকতক ছবি। আমি তাঁর শোবার ঘরে থাকি, এই ছবিগুলো সেই ঘরের দেওয়ালে টাঙানো। বেশ সুশ্রী সুঠাম স্বাস্থ্যবতী একটি পাহাড়ী মেয়ের ছবি। ছবিতে মনে হয় বছর পঁচিশ ছাব্বিশের মেয়ে। চারদিকের দেয়ালে তারই চারটে ছবি আছে। প্রত্যেক ছবিতেই আঁট বসনের সল্পতা চোখে বেঁধার কথা—কিন্তু মেয়েটার চাউনি আর হাসি এমন সরল সুন্দর যে, চোখে বেঁধা দূরে থাক, উল্টে মনে হয় ওই গোছের স্বল্প বেশ-বাস যেন ও-রকম মেয়েকেই মানায়।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এই মেয়েটি কে শংকরজী?

জবাবে মুচকি হেসেছিলেন তিনি, বলেছিলেন, একটা মেয়েই তো …কেন, পছন্দ হয়?

তারপর হঠাৎ যেন কিছু মাথায় এসেছে, বলেছেন, একটা সত্যিকারের ভালবাসার গল্প শুনবে, যাকে বলে ভয়াবহ ভাল-বাসার গল্প?

আমি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম। ভদ্রলোকের বড় বড় চোখদুটো মেয়েটির ফোটোগুলোর উপর ঘুরতে লাগল। ঠোঁটে হাসির আভাস প্রথম, চোখ কৌতুক। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই দৃষ্টি যেন কোথায় কোন দূরে হারিয়ে গেল। ফোটোর দিকে চেয়ে আছেন, কিন্তু নিজে যেন তিনি এঘরে নেই।

খানিক বাদে চমক ভাঙতে একটু অপ্রস্তুত। অল্প হেসে বললেন, আর একদিন বলব, আজ মুড্ নেই।

আমি সেই দিনই নিঃসংশয়, এই মেয়েটিই ভদ্রলোককে হয় ভরাট করে রেখেছে নয়তো শূন্য করে রেখেছে। এত হাসিখুশি দেখেই আমার কেমন ধারণা, শূন্যতার দিকটাই বড়। এবং মেয়েটির কারণেই ভদ্রলোক অকৃতদার।

তারপর থেকেই সেই অমুক্ত ভয়াবহ ভালবাসার গল্প শোনার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। কিন্তু সে-রকম অবকাশের মধ্যে তাঁকে পাইনি। বিকেলে হাসপাতালের কাজ সেরে এসে দুদিন ধরে আমাকে নিয়ে নিজের গাড়িতে কাছে দূরে বেড়াতে বেরুচ্ছেন। পাহাড়ের দিকে গেছি, জংগলের দিকে গেছি, ছোট ছোট পাহাড়ী ঝরণার ধারে পাথরের ওপর বসেছি। এ সব পরিবেশে ভদ্রলোকের তন্ময়তা বিস্ময়কর। মুখে আর বিশেষ কথা নেই তখন। পরিবেশের প্রাণটুকু যেন সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেন তিনি। তখন তাঁকে দেখলে মনে হবে মানুষের থেকে ভদ্রলোক বোধহয় পাহাড় আর জঙ্গল বেশি ভালবাসেন।

আর দেখলাম শংকর আরডে একজন পাথর বিশেষজ্ঞ। এতরকমের পাথর আছে জানতাম না। তিনি পাথর এক এক জায়গায় তুলে তুলে আমাকে দেখান আর চিনিয়ে দেন, এগুলো আর্কিয়ান গ্র্যানিট আর নিস, এগুলো ধারওয়ার যুগের মার্বেল আর শিস্ট। ...এগুলো চেনো? গণ্ডোয়ানা যুগের পলল পাথর, আর এটা ব্যাসল্ট। গোল গ্র্যানিটও এখানে অনেক পাওয়া যায়—বাইরে এসব পাথরের অনেক দাম। আগে আগে বিদেশেও পাথর চালান যেত এখান থেকে।

কিন্তু আমি পাথুরে রসিক নই।

বাড়ি ফিরেই আমি আশা করি, আজ বোধহয় সেই কাহিনীটি শুনতে পাব। কিন্তু সন্ধ্যার পর তাঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয় না বলতে গেলে। কোথাও বেরোন কিনা তাও বুঝতে পারি না। অথচ বেরুলে তো আমার জানতে বা দেখতে পাবার কথা।

সেদিন জিজ্ঞাসা করলাম, সন্ধ্যার পর তোমাকে বিশেষ দেখি না কেন শংকরজী—ক্লাবে ট্লাবে যাও নাকি?

—না, বাড়িতেই তো থাকি।

—তাহলে কি সন্ধ্যার পরেই ঘুমিয়ে পড়ো নাকি?

এ-কথার জবাব না দিয়ে তিনি মুচকি হাসলেন একটু। বললেন, আচ্ছা আজ দেখতে পাবে।

সন্ধ্যার পর থেকে আমি তাঁর প্রতীক্ষায় ছিলাম। মাঝে মাঝে দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে তাকাচ্ছি। ছবির ও স্বল্প-বসনা পাহাড়ী ছাঁদের মেয়ে দিন কে দিন আমার চোখে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছিল।

আরদালী এসে খবর দিল, সাহেব ওই কোণের ঘরে আছেন, সেলাম দিয়েছেন।

হন্তদন্ত হয়ে চললাম। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই অপ্রস্তুত একটু। একটা ছোট টেবিল, তার গায়ে লাগানো গদি আঁটা মস্ত ইজিচেয়ার একটা। টেবিলের ওপর মদের বড় বোতল একটা, আর গেলাস। কোণের দিকে মেঝেয় গোটা কতক সোডার বোতল। গেলাসটার চার ভাগের তিন ভাগ তরল সামগ্রীতে ভরাট। ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে শুয়ে আছেন শংকর আরড়ে। আমাকে দেখে দরাজ গলায় হেসে ডাকলেন এসো, দেখেই চক্ষু কপালে উঠেছে তো? বোসো—

হাত বাড়িয়ে গেলাসটা নিয়ে দু'চুমুক খেয়ে নিলেন। তারপর হেসেই বললেন, সন্ধ্যার পর কেন আমাকে দেখতে পাওনা বুঝতে পেরেছ? এই পান-বিলাস সকলের চোখে সয় না বলে খানিকটা লুকিয়ে কুকর্ম করি। তোমার একটু-আধটু চলে টলে নাকি?

হাঁ-না কিছু বলার আগেই তিনি নিজেই আবার সহাস্যে বলে উঠলেন, চলুক না চলুক—এই শরীরে তুমি এক ফোঁটাও পাচ্ছ না। দাঁড়িয়ে কেন, বোসো?

আমি তাঁর পাশে এসে একটা চেয়ার টেনে বসেই আবার একটা ধাক্কা খেলাম যেন। বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত! তাঁর সামনেই দেয়ালে টাঙানো প্রকাণ্ড একটা ছবিতে সেই মেয়ে। প্রায় এক মানুষ সমান বিশাল ছবি। সেই মেয়েই বটে, কিন্তু কারো সামনে সেদিকে তাকানো দায়। কোমরে সামান্য একটু আচ্ছাদন—সেও এত সামান্য যে, সোজাসুজি তাকালে কান লাল হবে। বাদবাকি

সর্বাঙ্গ নগ্ন। পা থেকে বুক পর্যন্ত। ওই বেশে ছুটে আসতে আসতে মেয়েটা হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়েছে দুটো হাত একটু তুলে। তারপর সামনে কাউকে দেখে দুষ্টু দুষ্টু হাসছে।

আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। আমাকে লক্ষ্য করে শংকর আরডে মিট মিট হাসছেন। চোখো-চোখি হতে জোরেই হেসে উঠলেন। বললেন, সাহিত্যিকের আবার এত লজ্জা কি, জীবনের গল্প লিখতে যাচ্ছ, ভালো করে মন ভরে দেখে নাও। ওই মেয়ে কিছু মনে করবে না, কেউ যখন ওকে হাঁ করে দেখত, তখনো কিছু মনে করত না, উল্টে ওই রকম হাসত—দেখো, দজ্জালি মেয়ের হাসিখানা দেখো না ভালো করে।

আমি তাকালাম আবার। দেখার মতো বটে। এমন সুন্দর কৌতুকমাখা হাসি আর দেখেছি কিনা জানি না। হাসির ফাঁকে দাঁতের আভাস ঝকঝক করছে। আকার সামনে যৌবন-প্রাচুর্যে উপছে ওঠা এক জীবন্ত মেয়েই দাঁড়িয়ে আছে যেন। আড়-চোখে তাকিয়ে দেখলাম, শূন্য গেলাস হাতে শংকর আরডেও সেই দিকে চেয়ে আছেন। স্থান কাল বিস্মৃত হয়েই যেন দেখছেন তাকে। আর এমনি দেখতে দেখতেই হাতের গেলাস খালি করে ফেলেছেন।

বাধা না পেয়ে ছবির দিকে আবার তাকালাম আমি। আমার ঘরের ছবিগুলোর দিকে চেয়ে যা মনে হত, এখনো তাই মনে হল। এ-ছবি সেগুলোর তুলনায় দশগুণ নগ্ন। আর দশগুণ জীবন্ত। তবু মনে হ'ল এই মেয়েকেই মানায়। কারণ নগ্নতা কাকে বলে এ মেয়ে যেন তাই জানে না।

দু'জনে এক সঙ্গেই সচেতন হলাম আমরা অন্যমনস্ক শংকর আরডে হাতের গেলাস টেবিলে রাখার সঙ্গে সঙ্গে তার খানসামা ঘরে ঢুকে গেলাসে বোতলের রঙিন পদার্থ ঢালছে। প্রতিবারের মাপ তার জানাই আছে বোধ হয়। সোডা মিশিয়ে দিয়ে সে প্রস্থান করল।

শংকর আরডে হাসি-হাসি মুখ করে জিজ্ঞাসা করলেন, ভালো করে দেখলে ?

আমি মাথা নাড়ালাম।

—কেমন ?

—কেমন সে-তো এখন আপনার ওপর নির্ভর করে। আসল রূপ তো এখন আপনি দেখাবেন।

কথাগুলো ঠিক মনঃপুত হল না যেন। গেলাস তুলে দুই এক চুমুক খেয়ে রাখলেন আবার। বললেন, ধরো, আর যদি কোনো রূপ না-ই দেখাই তোমায়—শুধু এই যা দেখছ তাই যদি সব হয়— তোমার লেখার মধ্যে মেয়েটার কোন রকম নোংরা মূর্তি আঁকতে পারবে তুমি ? এ-রকম ছবি দেখার পরেও পারবে ?

ছবির দিকে আবার তাকালাম আমি। আরডে কি বলছেন বা বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি। দেখার পর আবার তাঁর দিকে তাকিয়েছি। জবাবের আশায় ভদ্রলোক উদগ্রীব চোখে চেয়ে আছেন। যেন আমার এই একটা জবাবের ওপরেই অনেক কিছু নির্ভর করছে। সত্যি জবাবই দিলাম. বললাম, নোংরা মন না হলে নোংরা আঁকা শক্ত।

ভারী খুশি। শিশুর মতই খুশি। হেসে উঠলেন। গেলাস তুলে সানন্দে চোঁ-চোঁ চুমুক লাগালেন। তারপরেই হাঁক দিলেন, বয়— !

বেয়ারা এসে আবার গেলাসে রসদ এবং পানীয় ভরাট করে দিয়ে গেল।

তিনি হাসছেন তখনো। —বড় খাঁটি কথা বলেছি। চোখ যার আছে তার কাছ থেকে আমি এই জবাবই আশা করি।

আমি বললাম, তা তো হলো, রোজ রাতেই আপনি একধার থেকে এ-রকম ড্রিংক করেন নাকি ? সঙ্গে খাবার-টাবারও তো দেখছি না কিছু ?

আরডে হাসতেই লাগলেন। পরে বললেন, এই করেও এই ষাট বছর বয়সে আমার শরীর তোমার থেকে ঢের বেশি মজবুত হে।···হ্যাঁ অনেক রাত পর্যন্ত আমি ড্রিংক করি আর ওকে দেখি। যতক্ষণ না পর্যন্ত ও একেবারে রক্ত মাংসের মেয়ের মতো জীবন্ত হয়ে ওঠে আমার কাছে। কতদিন যখন ওকে আমি হাত বাড়িয়ে ধরতে যাই।···যখন মনে হয় মাতিলদা বকছে আমাকে, খেয়ে দেয়ে ঘুমুতে যেতে বলছে, তখন আমি ওর হুকুম তামিল করার মতো করে উঠে যাই। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

—মাতিলদা। কোথায় শুনেছি ওই নামটা? কোথায়? কি আশ্চর্য এখানকার ওই হাসপাতালটার নামই তো মাতিলদা হাসপাতাল।

জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটির নাম মাতিলদা?

—হ্যাঁ।

—কোন্ দেশের মেয়ে?

—এই দেশেরই এক জঙ্গল আর পাহাড়ী এলাকার আদিবাসী মেয়ে বলতে পারো। ওটা ওর মিশনারিদের দেওয়া নাম। মিশনারিরা এসে আদিবাসীদের বেশির ভাগকেই ক্রিশ্চিয়ান করে নিয়েছিল!

অনেক রাত পর্যন্ত অভিভূতের মতো বসে একটা গল্প শুনেছি। এর মধ্যে আরডের গেলাসে কতবার কত মদ আর সোডা ঢালা হয়েছে শেষের দিকে আর খেয়াল করিনি। বক্তা নিজেও না। কোথায় কোন্ জগতে আমরা চলে গেছলাম হুঁস ছিল না। সমস্ত রকম ব্যঞ্জনা বাদ দিয়ে এক মেয়ের যে জীবন চিত্রটি আমার চোখের সামনে ভেসে আসছিল সেটুকুই শুধু ব্যক্ত করব।

দুটি অন্তরঙ্গ বন্ধু। একজনের নাম বিনায়ক আর একজনের

নাম অশোক (শংকরজী বলেছিলেন, ধরো আর একজনের নাম অশোক—অশোক নাগেন)। দু'জন বিপরীত স্বভাবের মানুষ, কি করে তারা একাত্ম হল নিজেরাও জানে না। বিনায়ক এই জব্বলপুরের বাসিন্দা, অশোক ইউ. পি'র। বিনায়কের ছাত্রজীবন ইউ পি-তে কেটেছে, বন্ধুত্বের সূত্র সেটাই। দু'জনে একসঙ্গে পড়ত, খেলা করত, বেড়াতো। ভিতরে ভিতরে বিনায়ক দুরন্ত বে-পরোয়া স্বভাবের মানুষ, এই কারণেই অশোক পছন্দ করত তাকে। তার বাবা মা-ও পছন্দ করত। অশোকের বাড়িতে বহুদিন দুই বন্ধু এক শয্যায় রাত কাটিয়েছে।

পরের জীবনে অর্থাৎ কর্মের জীবনে খুব স্বাভাবিকভাবেই দু'জনে দুই রাস্তায় পাড়ি দিয়েছে। পিতৃপুরুষের ধারায় বিনায়ক ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মধ্যপ্রদেশ, ইউ. পি, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান করে বেড়াচ্ছে সর্বদা। অন্যদিকে অশোক নাগেন আগাগোড়া স্কলারশিপ পেয়ে ওপরের দিকে উঠেছে, ভূ-তত্ত্বে কৃতিত্বের সঙ্গে এম এ পাশ করেছে। দেরাদুনের বিশাল ভূ-তত্ত্ব গবেষণাগারে মস্ত অফিসার হয়ে বসেছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মানুষটা দার্শনিক, অফিসারগিরি মোহ তাকে পেয়ে বসেনি। বড় চাকরি করত এই পর্যন্ত। ভিতরে ভিতরে মানুষটা ন্যাচারালিস্ট অর্থাৎ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছে। তাই নিয়েই পড়াশুনা করে। গাছ-পালা পশু-পাখি নুড়ি পাথরের মধ্যে যেন পার্থিব সমস্ত রস পুঞ্জীভূত।

দুই বন্ধুর মধ্যে ছাড়াছাড়ি দূরের কথা, টানটা আরো নিবিড় হয়ে উঠেছিল। চিঠিপত্রে যোগ ছিলই, তাছাড়া অশোক নাগেন ছুটি পেলেই জব্বলপুরে চলে আসত। বিনায়ককে আগে থাকতে চিঠি দিত সে আসছে। বিনায়ক যেখানেই থাক, সেও চেষ্টা করত তখন চলে আসতে।

অশোক নাগেনের কাছে জব্বলপুর প্রাকৃতিক রহস্যের খনি বিশেষ। দূরের জঙ্গলে চলে যেত, নাওয়া-খাওয়া ভুলে সেই নির্জনে

আপন মনে ঘুরে বেড়াতো, গাছ-গাছড়া লতা-পাতা নেড়ে চেড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত, আর পাথর কুড়োতো। কুড়োতো আর পরখ করে করে দেখত, পাথরের ঠিকুজি-কুষ্ঠি যাচাই বাছাই হয়ে গেলে আবার ফেলে দিত, আর যে পাথর খুবই রহস্যময় ওর চোখে সেটা কাঁধের ঝোলার মধ্যে ফেলে দিত, এই করে প্রত্যেকবার পাথরের ঠিকি নিয়ে রওনা হত দেরাদুনে।

কিন্তু একবার তার তন্ময়তায় ব্যাঘাত ঘটল। দূরে ভানরের জঙ্গল আর পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গাছ-পালা পশু-পাখি নিরীক্ষণ করে দেখছিল পাথর কুড়োচ্ছিল। হঠাৎ ঝরণার ধারের একটা ফাঁকা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। চারদিকে পাথুরে জঙ্গল, ভিতরটা ফাঁকা। ঝরনার জল একটা নালার ভিতর দিয়ে পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে চলেছে। তার পাশেই বড় পাথরের ওপর মূর্তির মতই বসে আছে। বছর একুশ বাইশ হবে বয়েস, পরনে মোটা কাপড়ের খাটো ঘাগরা, বুকের ওপর চওড়া টকটকে লাল কাঁচলি। বসন এইটুকুই। মাথার চুলের বোঝা শক্ত করে পিছন দিকে টেনে বাঁধা, তারপর ঘোড়ার লেজের মতো পিঠে ছড়ানো। মাথার ঠিক পিছনেই সবুজ পাতা-সহ লাল ফুলে গোঁজা। নিবিড়পক্ষ গভীর কালো আয়ত তুটো চোখ, গায়ের রং লালচে বাদামী। পাথরের ওপর তুই পা মুড়ে পিঠ টান করে নিশ্চল মূর্তির মতো বসে আছে। হাত তুটো কোলের ওপর।

'নিষ্পলক চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। মেয়েটার সমস্ত অঙ্গের মধ্যে শুধু চোখতুটোই যেন অতিরিক্ত জীবন্ত। আর একটু যেন কৌতুক মাখাও।

অশোক নাগেন বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ। তু'জনে তু'জনকে দেখছে।

কোনো মেয়েকে দেখে মুহূর্তের মধ্যে এমন একটা মানসিক অবস্থা হতে পারে অশোকের ধারণা ছিল না। ওই মেয়ের চোখ,

মুখ, ঠোঁট ছুটো নগ্ন বাহু, কাঁচুলি বাঁধা অর্ধনগ্ন বক্ষোদেশ, খাটো ঘাগরা পরা পা গুটিয়ে বসা—সব কিছুর মধ্যে দুর্বার আকর্ষণীয় কিছু ছড়িয়ে আছে—কি সেটা অশোক নাগেন জানে না, শুধু রক্তের দ্রুত দোলায় সেটুকু অনুভব করতে পারে।

পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এলো। মেয়েটা একটু নড়ল না, একবারও চোখের পলক ফেলল না। সে যেন জানে লোকটা এগিয়ে আসবে। জানে, চোখের দুই কালো তারার অলক্ষ্য দড়ি বেঁধে সেই কাছে টেনে আনবে।

কাঁপা গলায় অশোক নাগেন দেশীয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে ?

আরো খানিক নিষ্পলকতার দিকে চেয়ে থেকে মেয়েটা পাল্টা প্রশ্ন করল, তুমি কে ?

—আমি···আমি একটা মানুষ।

মেয়েটার কালো চোখে কি কৌতুক ঝিলিক দিয়ে গেল একটু ? অশোক নাগেন জানে না। সেও ঠিক তেমনি করে বললে, আমি একটা মেয়ে।

—কিন্তু একলা এই জঙ্গলে কি করছ ?

—তুমি কি করছ ?

অশোক নাগেন ফাঁপরে পড়ল। মেয়েটা যেন তা অনুভব করল। নিশ্চল রমণী-অঙ্গে সাড়া জাগল একটু। সামান্য নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌবন যেন বাঁধ উপছোবার সুযোগ পেল। পাশটা দেখিয়ে বলল, বোসো—

এই আমন্ত্রণ এত সহজ সরল যে, অশোক নাগেন বিমূঢ়। ওই ছোট পাথরে বসতে হলে মেয়েটার গায়ে গা ঠেকিয়ে বসতে হবে। কিন্তু এই মেয়ের কাছে সেটা যেন কোন সমস্যাই নয়। একটা অননুভূত লোভ এই প্রথম যেন ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চাইল তার। কিন্তু শাসন করল নিজেকে। কাঁধের ঝোলা নামিয়ে

মেয়েটার পায়ের কাছে মাটিতে বসে পড়ল। তাই দেখে মেয়েটার চোখে নয়, ঠোঁটেও হাসি ভাঙল এবার।

—তোমার নাম কি ?

—অশোক···অশোক নাগেন। তোমার ?

—মাতিলদা।

—কোথায় থাকো ?

—গাঁয়ে, অনেক দূর এখান থেকে।···আমি এখানকার রানী, এখানকার এই জঙ্গলটুকুর। রোজ এখানে আসি। আমার সঙ্গে খাবার থাকে। আমাকে দেখলেই কাঠ বিড়াল আর পাখিরা খাবার লোভে এগিয়ে আসে। আমি ওদের খেতে দিই। হঠাৎ দেখলাম ওরা আসছে না, দূর থেকে দেখছে আমাকে—ওরা যেন ভয় পেয়েছে।

মেয়েটার গলার স্বর কান পেতে শোনার মতো নিটোল মিষ্টি। অশোক আছে তার দিকে। তার চোখ কান দুইই ভরাট হয়ে উঠছে।

মাতিলদার চোখে প্রচ্ছন্ন কিন্তু কপট রোষের অভিব্যক্তি। বলে গেল, আমি তখন চারিদিকে তাকিয়ে ওদের শত্রু খুঁজতে লাগলাম। তখন তোমাকে দেখলাম। আজ দু'দিন ধরে গাছ আর পাথরের আড়াল থেকে তোমাকে দেখছি। প্রথমে ভেবেছিলাম, পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে ওই জীবগুলোকে মারবে তুমি। শেষে বুঝলাম তুমি আসলে একটা পাগল, তাই আজ এখানে এসে বসেছি তোমার বিচার করব বলে।

....আমি পাগল।

মেয়েটা মাথা নাড়ল। তাই।

তেমনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে অশোক নাগেন তার দিকে চেয়ে থেকে হালকা মন্তব্য করল, তাহলে তুমিও পাগল।

সত্যিকারের রোষের অভিব্যক্তি এবারে। এ-রকম দুঃসাহসের কথা শুনতে অভ্যস্ত নয়।

—আমি পাগল কেন ?

—পাগল না হলে কেউ পাগলের ধারে কাছে এসে বসতে সাহস পায় ?

মাতিলদা জোরে শব্দ করেই হেসে উঠল। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওর সর্বাঙ্গ দুলে উঠল। তাজা যৌবন উপছালো। বলল, না, ভয় পাবার মতো পাগল নও তুমি।

—এবারে আমার বিচার কি করবে বলো। আগে অপরাধ কি শুনি।

—তোমাকে দেখে জীবগুলো ভয় পেয়েছে। তাছাড়া বিনা অনুমতিতে তুমি রাণীর এলাকায় ঢুকেছ।

কথাগুলো একটুও রুষ্ট মনে হল না অশোকের। উল্টে প্রশ্রয়পুষ্ট মনে হল। জবাব দিল, দোষ স্বীকার করছি, শাস্তি দাও।

—কি শাস্তি দেব তাই ভাবছি।

একটা বড় পাথর তুলে অশোক তার দিকে এগিয়ে দিল।

—এটা দিয়ে আমার মাথাটা ছাতু করে দাও।

প্রস্তাব শুনে মেয়েটা বড় চোখ করে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ও রকম শাস্তি আমি দিতে পারি না।

তাহলে এক কাজ করি। ওই বড় পাথরের ঢিপিটায় উঠে তোমার সামনের এই পাথরগুলোর ওপর লাফিয়ে পড়ি—শরীরটা আপনিই গুঁড়িয়ে যাবে।

বলে কপট গাম্ভীর্যে তাই করার জন্য অশোক নাগেন উঠে দাঁড়াতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে মেয়েটা নিজের পাথরটার ওপর প্রায় কোল ঘেঁসে বসিয়ে দিল তাকে। সেই স্পর্শে সর্বশরীরের রক্ত মাথায় উঠতে লাগল অশোকের। কিন্তু মেয়েটা সেদিকে একটুও সচেতন নয়। সকৌতুকে বলে উঠল, আচ্ছা মজার মানুষ তো তুমি !

অশোক গম্ভীর। জবাব দিল, দোষ করেছি শাস্তি পেতেই হবে …আর এক কাজ করতে পারো, তোমার ওই দুটো হাতে শক্ত করে আমাকে ধরে পিষে মেরে ফেলতে চেষ্টা করো।

বলতে বলতে গলার স্বর কেঁপে উঠল একটু। সভ্য জগতের শিক্ষিত মানুষ, তাই সহজাত দ্বিধা। কিন্তু অন্য দিকে প্রকৃতি বিজ্ঞানী সে, প্রকৃতির এমন সম্পদ আর বুঝি দেখেনি।

মেয়েটা খিল খিল করেই হেসে উঠল এবার! ছোট পাথরে দু'জনে বসার দরুণ নিজের জানু, কোমর, কাঁধ ওর অঙ্গের সঙ্গে ঠেকে আছে। মেয়েটার হাসিটার দমকে সেই স্পর্শ আরো নিবিড় হল। বলে উঠল, এত জোর আমার গায়ে আছে নাকি! তারপরেই সচেতন যেন একটু। তবু নিঃসংশয় নয় যেন। সামান্য ভ্রুকুটি করে হাসি মুখেই তাকালো তার দিকে। এই দৃষ্টিরও যেন স্পর্শ আছে। ওর তপ্ত নিঃশ্বাস নাকে মুখে ঠেকছে। বলল, আসলে কিছু একটা দুষ্টুমির মতলব তোমার।

অশোক নাগেন অবাক। মেয়েটা এত সরল! দুষ্টুমি যে ওর মাথায় আগুন হয়ে জ্বলতে চাইছে তাও বুঝতে পারছে না!

কি ভেবে আবার পায়ের কাছে নেমেই বসল সে। বলল, তাহলে শাস্তি দেবে না?

হাসি মুখে মাথা নাড়ল মাতিলদা, জবাব দিল, তুমি তো একটা আস্ত পাগল দেখছি, তোমাকে কি শাস্তি দেব!

—পাগল কেন?

—পাগল না হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কেউ গাছপালা নেড়েচেড়ে দেখে আর পাথর কুড়োয়? ঝোলাটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল ওটার মধ্যে অত পাথর জমিয়েছ কেন?

—দেখব বলে।

—দেখে কি হবে?

—আনন্দ পাবো।

অবাক। পাথর দেখে আনন্দ পাবে! সে কিরকম আনন্দ।

কি জবাব দেবে অশোক ভেবে পেল না। অদূরে একটা কাঠবিড়ালির দিকে চোখ গেল। কুতকুত করে দেখছে ওদের। অশোক আঙুল দিয়ে ওটাকে দেখালো। মাতিলদা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। অশোক জিজ্ঞাসা করল, ও কি দেখছে?

—আমাদের দেখছে?

কিন্তু আমরা দু'জনে কি আনন্দ পাচ্ছি ও বুঝছে? বলতে বলতে অবাধ্য দুটো হাত মাতিলদার দুই জানুর ওপরে রাখল সন্তর্পণে।

কিন্তু মাতিলদার সেদিকে হুঁসও নেই, চোখও নেই। মাথা নেড়ে জবাব দিল, তা অবশ্য বুঝছে না।

—তুমি চেষ্টা করলে ওকে সেটা বোঝাতে পারবে?

মাতিলদা আবার মাথা নাড়ল। পারবে না। অশোক নাগেন বলল, আমিও সেই রকম আমার নুড়ি-পাথর দেখার আনন্দটা তোমাকে বোঝাতে পারব না।

মাতিলদা সকৌতুকে চেয়ে রইল তার দিকে, নতুন একটা মজার জীব দেখছে যেন। তারপর আকাশের দিকে চেয়েই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল!—তুমি সর্বনাশ করলে আমার, ইস ঘরে যেতে কত দেরি হবে।

চোখের নিমেষে জঙ্গলের আড়ালে গা-ঢাকা দিল সে।

সমস্ত রাত আধা জেগে কাটিয়ে দিল অশোক নাগেন। বন্ধু বিনায়ককে তার নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে একটি কথাও বলল না। একটা স্পর্শ যেন তার সর্বাঙ্গে লেগে আছে তখনো।

সকালের প্রতীক্ষা। সকাল হতে দুপুরের প্রতীক্ষা। খেয়ে-দেয়ে বিনায়ক কাজে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে সে ভানরের জংলা পাহাড়ের দিকে চলল। অনেকটা পথ।

গিয়ে দেখে সেই পাথরে সেই মেয়ে বসে আছে। ওকে দেখেই হেসে উঠল। ঝকমকে দাঁতের সারি দেখা গেল। অঙ্গ দুলে উঠল।

উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র মানুষ অশোক নাগেনের ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে ওই মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। ধরলেও ও মেয়ে কিছু বুঝবে কিনা সন্দেহ।

কাছে এসে কাঁধের ঝোলা নামিয়ে পায়ের কাছটিতে বসল। মাতিলদা হাসিমুখে চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নাড়িয়ে দিল। আমি জানতাম তুমি আসবে।

—আমিও জানতাম তুমি আসবে।

—আমি তো রোজই আসি, তুমি নতুন এসে দস্যুর মতো এখানকার শান্তি লণ্ডভণ্ড করছ।

—তাহলে চলে যাই?

মাতিলদা হাসতে লাগল, তুমি একটা পাগল। তোমাকে এরই মধ্যে এত ভালো লেগেছে কেন জানো? আমি ছ'দিন ধরে লক্ষ্য করে বুঝেছি, তুমিও আমার মতো এই পাথর মাটি-জল-জঙ্গল গাছ-পালা পশু-পাখী ভালবাসো। এত ভালবাসো যে ধারে কাছে লোক থাকলেও টের পাও না। তুমি খুব মজার মানুষ।

অশোক বলল, তুমি না হয় ছ'দিন দেখেছ, তোমাকে আমার একদিনেই অত ভালো লাগল কেন?

—কেন?

আমি জানি না, তুমি বলো।

নির্বিকার খুশিতে মেয়েটা জবাব দিল, আমাকে তো সকলেরই ভালো লাগে, বিশেষ করে মরদগুলোর।

এই সরল উক্তিতেও মুগ্ধ অশোক নাগেন। কিন্তু অবাধ্য লোভ শরীর বেয়ে যেন মাথার দিকে উঠছে। হাত দুটোও ওর কোলের উপর উঠে এসেছে। কটি বেষ্টন করেছে। বাধা দেবার কোনো প্রশ্নই মেয়েটার মনে আসছে না।

জিজ্ঞাসা করল, আমার থেকে বেশি ভালো লাগে ওদের?

—তোমার কি রকম ভালো লাগে জানবো কি করে ?

—দেখাব ?

মাথা নাড়ল। অর্থাৎ দেখতে আপত্তি নেই।

—তুমি রাগ করবে না ?

অবাক একটু।—রাগ করব কেন !

পাথরের ওপর গা ঘেঁষে উঠে বসল অশোক নাগেন। দু'হাতে কাঁধ ধরে ওকে নিজের দিকে ফেরাল। তারপর আচমকা বুকে টেনে নিয়ে ওর অধরে নিজের দুই ঠোঁট নিবিড় করে বসিয়ে দিতে লাগল। ধমনীর রক্ত মাথার দিকে ধাওয়া করছে। বাহু বেষ্টন আর অধর নিপীড়নে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে তুলছে মেয়েটার।

অনেকক্ষণ বাদে ছেড়ে দিল। নিজের বুকের স্পন্দন যেন ঠকঠক করে কানে বাজছে। মেয়েটা বিহ্বল চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। তারপরেই উঠে ত্রস্ত হরিণীর মতো ছুটে চলে গেল।

সেই রাত আরো অস্থিরতার মধ্যে কাটল অশোক নাগেনের। এক দিকে বিবেকের দংশন অন্যদিকে দুর্বার আকর্ষণ। এ রকম হয় অশোকের ধারণা ছিল না। সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, অথচ জ্বলে জ্বলে ভস্ম হবার জন্য সমস্ত সত্তা সমস্ত অস্তিত্ব উন্মুখ যেন। মেয়েটা কাল আর নাও আসতে পারে মনে হতে আরো অস্থির হয়ে উঠল। ভাবল না যদি আসে, কাল সে নিজেই যাবে ওদের গাঁয়ে। তার ফলে যদি জীবন যায় তো যাক!

সমস্ত সকালটা অন্যমনস্কের মতো কাটল। বিনায়ক লক্ষ্য করেছে। জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে ?

—কি হবে ?

—সেই পরশু থেকে মনে হচ্ছে তুমি যেন তোমাতে নেই।

অশোক মিথ্যে বলল না। জবাব দিল, ঠিকই মনে হচ্ছে, কিন্তু এখন কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না।

শুধু মুখের দিকে চেয়েই কিছু আঁচ করতে চেষ্টা করল বিনায়ক, জিজ্ঞাসা করল না।

আজ অশোকের মনে হচ্ছে ভানরের পথ যেন আর ফুরোয় না। ভিতরে ভিতরে অনুক্ষণ এক দ্বন্দ্ব—মাতিলদা আসবে না? আসবে? আসবে না?

মন বলছে আসবে—আসবেই। তবু বিন্দুমাত্র স্বস্তি বোধ করছে না।

তারপর শান্তি। মাতিলদা সেই পাথরে বসে আছে। তারই প্রতীক্ষায় বসে আছে তাও বোঝা যায়।

সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে মাতিলদা সোজা তাকাল তার দিকে। তারপর হেসে ফেললো। অশোক গম্ভীর।—কাল ওভাবে ছুটে পালালে যে?

—তুমি ভয়ানক দুষ্টু, ও-রকম কাণ্ড করলে কেন? আমার সর্ব অঙ্গ কাঁপছিল কেন যেন।

—তোমার খারাপ লেগেছে?

মাতিলদা মাথা নেড়ে স্বীকার করল খারাপ লাগেনি।

অশোকের বিস্ময় বাড়ছে।—তুমি ও-ভাবে এ-পর্যন্ত কারো কাছে ধরা দাওনি?

মাতিলদা মাথা নাড়ল। দেয়নি। তারপর হাসতে লাগল।

—কি? অশোক উদগ্রীব।

মাতিলদা হাসি-হাসি মুখ করে বলল, আগে মরদগুলো হাত ধরে টানাটানি করলে খুব রাগ হত, আজকাল কেন যেন ওদের ভালো লাগে আমার।

—তারা আমার মতো ও-রকম দুষ্টুমি করতে আসে না?

—না, এখনও তো সকলেই জানে আমার কত জানি বয়েস পেরুলে আমাকে সর্দার-পুরুতের কাছে ভোগ দেওয়া হবে। সর্দার পুরুতের ভোগের জিনিস কেউ ছুঁলে তার গর্দান যাবে।

অশোক হতভম্ব। পায়ের কাছে বসে দু'হাতে তার কোমর বেষ্টন করল।

—তোমার কত বয়েস পেরুলে?

—সে আমি জানি না।

—তোমাদের সর্দার পুরুতের বয়েস কত?

—অনেক। তিন বছর আগে তার বউ মরে গেছে। এখন একটা মেয়ে আছে তার কাছে, কিন্তু সে ভোগ নয়। আমি ভোগ। আমাকে যখন নেবে তখন গাঁয়ে মস্ত উৎসব হবে।

অশোকের বুকের ভিতরটা কাঁপছে। নির্ণিমেষে দেখছে ওকে।
—তুমি সর্দার পুরুতকে ভালবাসো।

মুখের দিকে চেয়ে মাতিলদা মিটিমিটি হাসছে।

—ভালবাসো?

চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়ল, ভালবাসে না। তারপর বলল, সর্দার পুরুত জানলে বা আর কেউ জানলে আমার গায়ের ছাল-চামড়া তুলে নেবে।

—কেউ জানবে না, মাটিতে বসেই তাকে আর একটু কাছে টেনে নিল—ভালবাসো না কেন?

—আমার বাবার সমান বয়েস, আর বড় নিষ্ঠুর।

—তবু তুমি তার ভোগে যাচ্ছ?

—আমি ও নিয়ে ভাবিই না, ভোগ কাকে বলে তাও জানি না।

ধমনীর রক্ত অস্বাভাবিক দাপাদাপি করছে অশোকের। পাথরের থেকে ওকে নিজের বুকে টেনে নিল। তারপর গত দিনের মতই অবশ করে দিতে চাইল ওকে—গত দিনেরও দ্বিগুণ আবেগে। বলে উঠল, না না, তুমি সর্দারের কাছে যাবে না—তুমি আমার, আমার কাছে থাকবে, আমি তোমাকে নিয়ে চলে যাব। যাবে? যাবে আমার সঙ্গে?

রমণীর দুটি নিটোল বাহু সবলে আকর্ষণ করল তাকে। আনন্দে

আটখানা। বলে উঠল, এরই মধ্যে তোমাকে কত ভালো লেগেছে জানো না—আজ আমিই তোমাকে এই কথা বলব ভেবেছিলাম—আমার আগে তুমি বললে।

সমস্ত বাধা-বন্ধনের অবসান যেন। পুরুষের তাড়নায় বিপুল ঘন-বিস্ময়ে বাহুবন্দিনী রমণীর প্রথম সমর্পণ। বনভূমি নিশ্চল, নিথর।

সেই রাতেই বন্ধু বিনায়কের কাছে সমস্ত খোলাখুলি বলল অশোক নাগেন। তিন দিনের প্রতিটি মুহূর্তের কথা। কিছুই গোপন করল না। এই বন্ধুর কাছে তার গোপন বলে কিছু নেই।

শুনে বিনায়কও স্তব্ধ খানিক। তারপর বন্ধুর পিঠ চাপড়ে তারিফ করল। তারপর চিন্তিত মুখে বলল, ওই আদিবাসীরা এমনিতে ভালো লোক কিন্তু রাগলে সাংঘাতিক। মাতিলদাকে নিয়ে তোমাকে কালই এখান থেকে পালাতে হচ্ছে।···আচ্ছা, এতখানি বীরত্ব দেখাতে পেরেছ যখন বাদ-বাকি ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

পরদিন গাড়ি নিয়ে দুই বন্ধু ভানরে উপস্থিত। মাতিলদা আসামাত্র তাকে জংগল থেকে বার করে এনে গাড়িতে তোলা হল। বন্ধুর পরিচয় শুনে খুশি। প্রথম মোটরে চড়ছে। তাতেও খুশি। খুশির প্রতিমূর্তি যেন। বিনায়ক ঘাড় ফিরিয়ে মাঝে মাঝে দেখছে ওকে। ঘাড় ফিরিয়ে, কারণ গাড়ি সেই চালাচ্ছে। তারও ভালো লাগছে মেয়েটাকে। বন্ধুর পছন্দের তারিফ না করে পারছে না।

ফাঁকা রাস্তা ধরে প্রায় একশ মাইল চলে আসার পর অশোক বলল, মাতিলদার পোশাক বদলে নেওয়া দরকার।

বিনায়ক জিজ্ঞাসা করল, কি পরবে? শাড়ি?

···না, সালোয়ার কামিজ পরতে পারে।

গাড়ি থামিয়ে প্রায় ঘুরে বসে বিনায়ক মাতিলদাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখল খানিক। তারপর বলল, এই পোশাকের মতো আর কোন পোশাকে এরকম মানাবে না, কিন্তু কি আর করা যাবে, ঠিক আছে।

আরো মাইল দশেক আসার পর এক দোকান থেকে নতুন পোশাকের ব্যবস্থা হল মাতিলদার। আন্দাজেই কিনে আনতে হয়েছে। এই বেশে ওকে আর দোকানে নিয়ে যাওয়া যায় কি করে। বিনায়ক হেসে বলেছে, সভ্যতার কত গলদ দেখেছ ?

নতুন পোশাক পেয়ে মাতিলদা ভারী খুশি। কিন্তু কি করে পরবে ? কোথায় পরবে ? একটি ছোট পাহাড়ের আড়ালে নিয়ে গিয়ে অশোক তাকে নতুন পোশাক পরিয়ে নিয়ে এলো। ফিরে এসে দেখে বিনায়ক হাসছে খুব। মাতিলদা আনন্দে আটখানা।

অশোকের দেরাদুনের বাড়িতে ক'টা দিনের জন্য যেন সুখের হাট বসে গেল। বন্ধুকেও খুব ভালো লেগেছে মাতিলদার। অনেকবার করে বলেছে, ভদ্রমানুষেরা যে এত ভালো আমি জানতুম না।

বন্ধুর দিকে চেয়ে বিনায়ক বলে, এতদিনে তোমাকে আমার হিংসে হচ্ছে।

তার কাজ-কর্মে ক্ষতি হচ্ছে। আর থাকা চলে না। কিন্তু যাবার নামে অশোকের আপত্তি। আর মাতিলদা তো তার হাত ধরে ঝুলেই পড়ে, যাবে না বললে তবে ছাড়ে।

শেষে যাবেই ঠিক করল একদিন। অশোকই বা কত আর বাধা দেবে। পরদিন যাবার কথা, আগের রাতে মাতিলদা রাগ করেছে ওর ওপর। বলল, কেন যেতেই হবে কেন ?

অশোক ফস করে বলে বসল, ওর রাগ হয়েছে বলে যাবে।

—কেন রাগ কেন ?

—রাগ হবে না ? এতদিনের মধ্যে তুমি ওকে একদিনও আদর করেছ ?

মাতিলদা সত্যি সত্যি অপ্রস্তুত। —কই তুমি তো একদিনও বলো নি। ঠাট্টা কিনা বুঝছে না, জিজ্ঞাসা করল, আদর করব এখন ?

বিনায়ক হাসছে বটে, কিন্তু দেখছে সরলতাও কত সুন্দর হয়।

ছদ্ম গাম্ভীর্যে অশোক বলল, নিশ্চয় করবে।

ত্রুটি সারার জন্য মাতিলদা বিনায়কের দিকে এগিয়ে এলো। কপট রোষে বিনায়ক ধমকে উঠল, এই— !

সঙ্গে সঙ্গে মাতিলদা ফিরে চোখ পাকালো !—কি আমাকে ধমকাবে, আমি জগতে কাউকে কেয়ার করি ! বলেই দ্বিগুণ তেজে চড়াও হল তার ওপর, তারপর গলা জড়িয়ে ধরেই গালে আর ঠোঁটে একধার থেকে চুমু !—হোল তো, আর রাগ না করে আরো ক'টা দিন থেকে যাও।

বিনায়কের সমস্ত মুখ আরক্ত। অশোক হেসে সারা। বলল, তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন—ওর কি কিছু জ্ঞান-গম্যি আছে।

জ্ঞান-গম্যি না থাকার মতো কি করল মাতিলদা ভেবে পেল না। দুই বন্ধুর দিকে তাকাতে লাগল। মরদটার অত হাসির কারণও ঠিক বুঝতে পারছে না। সেও হেসে বিনায়ককেই জিজ্ঞাসা করল, কি হোল, আরো আদর চাই ?

বিনায়ক দু-হাত জোর করে সোজা উঠে দাঁড়াল, তারপর তিন হাত সরে গিয়ে বলল, দোহাই তোমার ওইতেই ঘায়েল হয়ে গেছি আর আদরে কাজ নেই। কথা দিচ্ছি আরো দুটো দিন থাকব।

দু'দিন বাদে মাতিলদা গোপনে আবার অশোককে জিজ্ঞাসা করেছে, আবার আদর করলে আরো দুটো দিন থেকে যাবে ও ?

অশোক নাগেন হেসে বাঁচে না। বন্ধুর কাছে ওর কথা ফাঁস করে দিয়েছে ? মাতিলদা ছুটে পালিয়েছে।

আবার শিগ্‌গীরই আসবে। কথা দিয়ে তবে সেবারের মতো ছাড়া পেয়েছে বিনায়ক।

মাস কয়েক বাদে সত্যিই আবার এসেছে বিনায়ক। কথা

দিয়েছে বলে নয়, যখন-তখন একটা আকর্ষণ অনুভব করে বলেই এসেছে। বন্ধুকে বলেছেও সে-কথা। বলেছে, তুমি এমন বন্ধু না হলে ব্যাগড়া দিতাম।

লক্ষ্য করেছে সত্যিকারের সুখে ভরপুর ওরা দু'জনে। এ-যাত্রাও দু-দিনের জন্য এসে সাতদিন কেটে গেছে।

এক বছরের মধ্যে ঘুরে ফিরে এমনি বার তিনেক বন্ধুর কাছে দেরাদুনে এলো বিনায়ক। প্রতিবারই আনন্দের হাট বসিয়ে দিয়ে গেল সে। যাবার সময় মাতিলদার মুখ ভার। শেষের বারে ওকে বলল, তুমি এলে তোমার বন্ধু ডবল আনন্দে থাকে—নইলে আজকাল বড় বেশি বই পড়ে।

বিনায়ক সচকিত। কেন তোমাকে আগের মতো আদর করে না?

মাতিলদা তক্ষুণি প্রায় মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল, করে না আবার, না করলে ওকে আমি রক্ষে রাখব!

মেয়ে বটে একখানা। যৌবনের তপ্ত শিখা। ওদিকে সরলতার প্রতিমূর্তি যেন। এই দুটো একসঙ্গে মেশে কি করে বিনায়ক ভেবে পায় না।

ওর সামনেই বন্ধুকে চোখ রাঙায়, কি হে ওকে ছেড়ে আজকাল নাকি বইয়ের দিকে বেশি মন দিয়েছ?

মাতিলদা মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে, আমাকে ছেড়ে বলেছি?

বিনায়ক জিজ্ঞাসা করে, তোমাকে না ছেড়েই বই পড়ে?

মাতিলদা জবাব খুঁজে পায় না। সেই মূর্তি দেখেও দুই বন্ধু হাসে। অশোক বলে, আসলে ওই আমাকে ছেড়েছে খানিকটা, ওর এখন বান্ধবী জুটেছে।

—কক্ষনো না!

পলকা গাম্ভীর্যে অশোক তাকে জিজ্ঞাসা করে, পার্বতীর চাকরি আছে তো?

মাতিলদা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, ইস্, থাকবে না আর। আমি নিজে গিয়ে ওর মালিককে ঠাণ্ডা করে এসেছি না!

অশোক ভালো মুখ করে শুধোয়, কি করে ঠাণ্ডা করলে আদর-টাদর করে?

মাতিলদাও সাদাসিধে জবাব দেয়, দরকার হলে করতাম, দরকার হয়নি।

বিনায়ক উৎসুক শ্রোতা। এই পর্যায়ে বাধা দেয়, ব্যাপারখানা কি?

শুনল, মাতিলদার এক প্রিয় বান্ধবী জুটেছে, নাম পার্বতী। এখানকার ফরেস্ট রিসার্চ অফিসারের বাড়ীর আয়া। লক্ষ্ণৌতে বাড়ী তার। তা তুজনের এমনই ভাব যে দরকারের সময় অশোক মাতিলদাকে খুঁজে পায় না, আর ও-বাড়িতে আয়াকে। কিছুদিন আগে তুই বান্ধবী তুপুরে খেয়ে-দেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। মাতিলদাই তাকে টেনে নিয়ে গেছল। যেতে যেতে সাত মাইল দূরের সেই জঙ্গলে। জঙ্গলের মাঝে পা সুড়সুড় করে মাতিলদার। বান্ধবী পার্বতী ভয়ে জড়সড়, আর মাতিলদার ফুর্তি। ও প্রস্তাব করেছিল সেই রাতের মতো এই জঙ্গলেই থেকে গেলে কি হয়।

বাড়ি ফিরেছে রাত্রিতে। অশোক নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু পার্বতীর স্বামী আর মনিব বাড়ির লোক বেরিয়ে পড়েছিল ওদের খুঁজতে। পার্বতীর স্বামী ওই মনিবের আপিসের পিওন। কাঠ-খোট্টা লোক।

বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মনিব বাড়ি থেকে পার্বতীর জবাব হয়ে গেল। এ-রকম বে-আক্কেলে আয়া তারা রাখবে না। ওর স্বভাব-চরিত্র নিয়েও তাদের সন্দেহ হয়েছে। একা জঙ্গলে গেছল বিশ্বাস করেনি। ভয়ে দিশেহারা পার্বতী তখন স্বামীর কাছে না গিয়ে এখানে চলে এসেছে। হাতের মুঠোয় পেলেই স্বামী ওকে ঠেঙিয়ে আধ-মরা করবে। বান্ধবীর চাকরি গেল কেন আর স্বামী

ঠেঙাবে কেন মাতিলদার সেটা বুঝতে সময় লাগল। বোঝার পর সে কি রাগ!

—চল্ তো!

হাত ধরে ওকে টেনে নিয়ে চলল স্বামীর ঘরে। পার্বতী বয়েসে বছর তিনেকের বড়ই হবে, কিন্তু মাতিলদার কাছে ওই যেন শিশু। ওকে নিয়ে সরাসরি স্বামীর কাছে হাজির।—শোন, পার্বতীকে আমি জঙ্গলে টেনে নিয়ে গেছলাম, ওর কোন দোষ নেই, ওর গায়ে তুমি হাত তুলবে তো সে-হাত দুখানা করে কেটে দেব আমি। সাবধান বলে দিলাম—

তারপরই পার্বতীর হাত ধরে টেনেছে আবার!—চল্ তোর মনিবের বাড়ী, চাকরি কি করে যায় আমি দেখছি।

গেছে। মনিবকে ওই এক কথাই বলেছে। সব দোষ ওর, পার্বতীর কোনো দোষ নেই। ওই মূর্তি দেখেই মনিবের অবস্থা কাহিল, তবু সে তো আর পিওন নয়, অফিসার। বলেছে, কিন্তু এভাবে যাওয়া তো অন্যায়?

—অন্যায় কেন? মাতিলদা ফুঁসেই উঠেছে, তোমাদের এই ভদ্র-লোকের শহরে আমাদের কেমন হাঁপ ধরে যায় সে-খবর তোমরা রাখো? তাছাড়া অন্যায় হলে আমার ঘরের লোক আমাকে বলত না কিছু।

অতএব পার্বতীর চাকরি যায়নি। আর সেই থেকে মাতিলদা ওর আরো প্রিয় বান্ধবী হয়ে উঠেছে।

মাস ছয়-সাত বাদে বিনায়ক বন্ধুর চিঠি পেল মহারাষ্ট্রে বসে। লিখেছে মাতিলদাকে নিয়ে বেশ ফ্যাশাদে পড়েছে সে। তার বন্ধু পার্বতী মারা গেছে। ছেলেপুলে হবার জন্য বায়না ধরে দেশে গেছল। সেখানে সময়ের আগেই হঠাৎ কি গণ্ডগোল হয়। তিন দিন বাদে সে হাসপাতালে মারা যায়। পার্বতীর স্বামীর মুখে মাতিলদা শুনেছে, অযত্ন করে হাসপাতালের লোকেরাই তাকে মেরে ফেলেছে। দুদিন কোন চিকিৎসাই হয়নি। জায়গার অভাবে, বাইরের বারন্দায় ফেলে

রেখেছিল—পরে বে-গতিক দেখে তারা যখন তৎপর হল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

সেই থেকে রাগে মাথা খারাপ হবার দাখিল মাতিলদার। অশোককে জিজ্ঞাসা করেছে, এ-রকম হয় কেন। সে বলে ফেলেছিল, গরিবদের ওপর এ-রকম অবিচারই হয়ে থাকে। ব্যস্, ছোরা নিয়ে তক্ষুণি প্রস্তুত মাতিলদা, পার্বতীর দেশে যাবে, যারা তার বন্ধুকে মেরে ফেলেছে। তাদের শিক্ষা দেবে!

অনেক করে ওর পাগলামি থামানো হয়েছে, টাকা হলে এরপর এমন এক হাসপাতাল করা হবে যেখানে গরিবের এতটুকু অযত্ন হবে না। মাতিলদার ধারণা ও-রকম একটা হাসপাতাল হলেই এ-দেশের সমস্ত গরিবের সমস্যা মিটে যাবে।

মাতিলদাকে নিয়ে এরপর থেকে মাঝে মাঝে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে লাগল অশোক নাগেন। তার শহরে মন টেকে না। খেয়াল হলেই দূরের পাহাড়ে আর জঙ্গলে চলে যায়। বারণ করলে তর্ক করে না কিন্তু রাগ করে। কেবল ছুটি-ছাটায় ওকে নিয়ে অশোক যখন বেরিয়ে পড়ে তখনই মহাখুশি। সেও কোন শহরে যাওয়া চলবে না, যেতে হবে লোকালয় বর্জিত পাহাড় আর জঙ্গলে। তখন ওর খুশি ধরে না। সে-সময় সালোয়ার কামিজ ছেড়ে আগের মতই ঘাগরা আর কাঁচুলি পরে। নিজের প্রাণের খুশিতেই আদরে আদরে ওকেও তখন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। অশোক নাগেন তখন যেন আগের মতই মাতাল হয়ে পড়ে, তার নেশা ধরে, মাতিলদা-নেশা।

কিন্তু আবার ফিরে আসতে হয় তার কাজের শহরেই। আর, কিছুদিনের মধ্যেই ভিতরে ভিতরে একটা অসহিষ্ণুতার বাষ্প জমতে থাকে ওর মধ্যে। তার মরদের কর্মস্থলে যে আবার ফিরে আসতেই

হবে, সেটা বুঝতে পারে হয় তো, কিন্তু ভিতর থেকে মেনে নিতে পারে না।

এক এক সময় বায়না ধরে জব্বলপুর যাবে। সেখান থেকে রোজ ভানর পাহাড়ের সেই জঙ্গলে গিয়ে বসবে দু'জনে। সেই পাথরটায়। কাঠ-বিড়ালি আর পাখিগুলোর জন্য খাবার নিয়ে যাবে। ওদের খেতে দেবে। তারপর···। তারপর কি বলতে গিয়ে হঠাৎ লজ্জায় অশোকের কোলে মুখ গুঁজে দেয়।

ওর ধারণা ওদের সমাজের লোকেরা ওকে দেখতে পেলেও আর কিছু বলবে না। কতকাল তো কেটে গেছে। এই একটা বছর মাতিলদার কাছে কতকাল। এতদিনে সর্দার পুরুতের জন্য নিশ্চয় অন্য ভোগের মেয়ে যোগাড় হয়ে গেছে। তাছাড়া যখন জানবে ও কত বড় এক ভদ্রলোকের কাছে আছে, তখন আর কিছু বলবে না। ভদ্র-লোকদের ওদের সমাজের মানুষ একটু ভয় করে আর সমীহ করে। কিন্তু মাতিলদার নিজের মনেই খটকা বাঁধে আবার। যত ভয় আর সমীহই করুক, সর্দার পুরুতের অপমান বা তাঁর সঙ্গে বঞ্চনা বরদাস্ত করা রীতি নয় ওদের সমাজের মানুষদের।

অশোক কখনো হাসে, কখনো বিরক্ত হয়। বিরক্ত হয় কারণ দু-মাস যেতে না যেতে মাতিলদা আবার বেরিয়ে পড়ার জন্য অস্থির। কিছু না বলে কয়ে দূরে পাহাড়ী জঙ্গলে চলে যায় এক একসময়, সেখানকার আশপাশের আধাসভ্য মানুষদের কুঁড়ে ঘরে দু'তিন দিন করে থেকেও যায়। সেখানকার লোকেরা ওকে ভাল রকম চিনে ফেলেছে নাকি। আদর করে রাখে। আবার ঘরের টান বাড়লেই ছুটে চলে আসে। অশোক এখন আর কিছু বলে না, বাধাও দেয় না। বলে বাধা দিয়ে লাভ নেই। কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হয় ঠিকই।

এরই মধ্যে একটা বড় রকমের বিভ্রাট হয়ে গেল। বিভ্রাটটা যে কত বড় গোড়ায় গোড়ায় মাতিলদা ঠাওরই করতে পারল না।

গবেষণা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সামান্য কি মনোমালিন্যের ফলে আত্মাভিমানী মানুষটা চাকরিতে সোজা ইস্তফা দিয়ে বসেছে। তাই নিয়ে মানসিক অশান্তি। মেজাজ-পত্র খারাপ। ওখানে বসেই আর কিছু করা যায় কিনা সেই চেষ্টায় আছে। তখন থেকে ধমক-ধামক খেতে শুরু করল মাতিলদা। প্রথম প্রথম ও রাগের কারণ বুঝতে পারত না। অকারণে ধমক খেয়ে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকত।

পরে শুনল এবং বুঝল। নরম মুহূর্তে অশোকই একদিন বুঝিয়ে বলল। শুনে আর বুঝে মাতিলদা মহা খুশি।—তাহলে আর এখানে বসে আছি কেন, চলো চলে যাই আমরা।

—কোথায় যাবে ?

—কেন, জঙ্গলে পাহাড়ে !

—খাবে কি ?

—সে আবার ভাবনা কি ? তোমার কাছে একটু জমি-জমা কেনার মতো কিছু টাকা নেই ?

—তা তো আছে।

—তবে ? তোমরা খাও তো মাছ আনাজ ভাত আর রুটি। জমি নিয়ে আমরা একটা ঘর তুলব। সেই জমিতে আনাজ হবে, গম হবে আর ধান হবে। আর ঝরণার নদীতে তো এন্তার মাছ। আমাদের সমাজের মানুষগুলো তো এইভাবেই দিব্বি কাটিয়ে দিচ্ছে।

অশোক হাসবে কি রাগ করবে ভেবে পায় না। আবার মাতিলদা তার লোকটার মিছিমিছি এত দুশ্চিন্তা কেন বুঝে ওঠে না।

মেজাজ দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে অশোকের। মাতিলদার প্রতি ব্যবহারও রুক্ষ হয়ে উঠছে। ও লক্ষ্য করে লোকটাকে। অভিমানে দূরে সরে থাকে। আবার কাছে না এসেও পারে না। এই টানা-

পোড়েনে ভিতরে ভিতরে মেয়েটা যে কত ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে অশোক তা কল্পনাও করতে পারে না।

একদিন সরাসরি এসে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি চাও বলো তো, আমি চলে যাব তোমাকে ছেড়ে?

অশোক সচকিত।—কেন?

—তুমি এখন আমার সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করো কেন? তুমি হাস না কেন? আমাকে বকো কেন?

অশোকও ভিতরে ভিতরে তিরিক্ষি—সেই জন্যে আমাকে তুমি ছেড়ে যাবে?

—না। তুমি কি চাও আমি জিজ্ঞাসা করছি।

—টাকা চাই। অনেক টাকা। দিতে পারবে?

মাতিলদা বিমূঢ় খানিক। মাথায়ই ঢুকছে না যেন।—টাকা চাও। আমাকে চাও না? আমাকে ভালবাসো না?

—বাসি কিন্তু আমাদের সভ্য সমাজে ভালবাসা জিইয়ে রাখতে হলে টাকার দরকার হয়। টাকা না থাকলে ভালবাসা মরে যায়, সব অন্ধকার হয়ে যায়। বুঝলে?

মাতিলদা কিছুই বুঝল না। হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল। এর দুদিন বাদে বিনায়ক এসে হাজির। তার এবারের পদার্পণ শুভ কি অশুভ কেউ জানে না। চাকরিতে ইস্তফা দেবার সংবাদটা বন্ধুকে আগেই জানিয়েছিল অশোক।

বিনায়ককে পেলে সব থেকে বেশি খুসি মাতিলদা। বলেছে, এবারে তোমার বন্ধুকে আর আমাকে দুজনকেই নিয়ে চলো এখান থেকে—ও এখান থেকে এক পা নড়বে না। এই জায়গা যেন ওর শেকড়ের জমি।

দুদিনের মধ্যেই সমস্ত সমাচার বুঝে নিয়েছে বিনায়ক। অশোক বলেছে। মাতিলদাও বলেছে। দুই বন্ধুর মধ্যে শলাপরামর্শ হতে দেখেছে মাতিলদা। আশান্বিত হয়ে বিনায়ককে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা

করেছে, এ জায়গা ছেড়ে যেতে রাজি হয়েছে ?

বিনায়ক মাথা নেড়েছে, রাজি হয়নি।

মাতিলদা রেগে গেছে, তুমিও রাজি করাতে পারছ না ! এইভাবেই চলবে তাহলে ?

বিনায়ক হাসতে চেষ্টা করেছে। কি-রকম চোখে দেখেছে ওকে। মাতিলদা বোঝেনি কি-রকম। মোট কথা, বন্ধুর হাবভাব এবারে অন্যরকম লেগেছে তার। ওর সামনে অশোককেই বলেছে, তোমার জন্যে তোমার বন্ধুও এবারে কেমন বদলে গেছে।

বিকেলের দিকে বিনায়কের সঙ্গে মাতিলদা বেড়াতে বেরিয়েছে এই কদিন। অশোকের নামে বন্ধুর কাছে সে অজস্র নালিশ করেছে। জিজ্ঞাসা করেছে, তোমাদের সভ্য সমাজে ভালবাসা জিইয়ে রাখতে হলে টাকার দরকার হয়, এর অর্থ কি ? টাকা না থাকলে ভালবাসা মরে যায়, সব অন্ধকার হয়ে যায়—এর অর্থ কি ?

অর্থের ফয়সালা নিয়ে অশোকের সামনেই বিনায়ক হাসাহাসি করে আসর জমাতে চেয়েছে। কিন্তু আসর জমেনি। অশোক অতিরিক্ত গম্ভীর। একটু বাদে উঠে চলেই গেছে। কিন্তু আসলে ঘরের সামনের অন্ধকার বারান্দায় সে পায়চারি করছিল। বিনায়কের কৌতুক মেশানো হাসি আর চাপা উক্তি তার কানে গেছে। মাতিলদাকে বিনায়ক বলছে, টাকা তো যত খুশি ইচ্ছে করলে তুমিই ওকে দিতে পারো।

মাতিলদা চাপাচাপির ধার ধারে না, অবাক বিস্ময়ে আর আগ্রহ-ভরে জিজ্ঞাসা করেছে, কি করে ?

জবাবে বিনায়ক জোরেই হেসে উঠেছে।

পরদিন সন্ধ্যায় বেরিয়ে ফিরেই সোজা অশোকের কাছে চলে এসেছে মাতিলদা। উত্তেজনায় লালচে মুখ আরও লাল।—আচ্ছা দশ হাজার টাকা কত টাকা ?

জবাব না দিয়ে অশোক চেয়ে রইল খানিক। তারপর বাইরের

দিকে মন দিল আবার। বাইরে থেকে বিনায়ক দেখছে, শুনছে আর হাসছে মিটিমিটি।

—আঃ, বলো না।

অশোক মুখ থেকে বই সরালো আবার।—কি?

—দশ হাজার কত টাকা?

—অনেক। কেন?

—এমনি। সত্যি, খুব অনেক?

অশোক জবাব দিল না। চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মাতিলদা ধরেই নিল, দশ হাজার টাকা অনেক টাকা। একেবারে নিশ্চিত হবার মতোই অনেক টাকা।

তুদিন বাদে বিনায়ক চলে গেল।

কিন্তু এবারে মাতিলদা বাধা দিল না তাকে। আটকাতে চেষ্টা করল না। সে চলে যাবার পরেও হাসিখুশি। সকৌতুকে চেয়ে চেয়ে অশোকের গম্ভীর মূর্তিখানা দেখে আর হাসে অল্প অল্প। মজার কিছুই ঘটতে যাচ্ছে যেন।

অশোক লক্ষ্য করেও করে না।

আরো দিন পাঁচেক পরের কথা। রাত্রিতে আদরে আদরে অশোককে একেবারে অস্থির করে তুলল মাতিলদা। তার সমস্ত গাম্ভীর্য রসাতলে পাঠিয়ে ছাড়ল। শহরের বুকে শহরের একঘরে ভানরের সেই বনভূমির নিবিড়তা ফিরিয়ে আনতে চাইল আবার। ফিরিয়ে আনল।

তার পর দিন সকাল থেকে মাতিলদা নেই।

নেই নেই কোথাও নেই।

আগেও এক-একবার দিন কতকের জন্য নিখোঁজ হয়েছে সে! কিন্তু এবারে দিনের পর দিন কাটতে লাগল। সে নেই।

এ-পর্যন্ত এসে এই প্রথম প্রশ্ন করে বাধা সৃষ্টি করলাম। বললাম, শংকরজী এখানে আগে থাকতে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। মাতিলদা চলে যাবার পর অশোকের সঙ্গে বিনায়কের আর দেখা হয়েছিল ?

শংকর আরডে থমকে তাকালেন আমার দিকে। অত মদ খাবার ফলেই মুখ লাল কিনা জানি না। ফিরে প্রশ্ন করলেন, কেন ?

—কারণ, এরপর আপনি যা বলছেন, অশোক নাগেনের তা জানা না থাকলে আমার মনে গোড়া থেকেই একটা অসঙ্গতি উঁকিঝুঁকি দেবে।

আমার মুখের ওপর শংকর আরডের গম্ভীর দু'চোখ স্থির হয়ে রইল আরো খানিক। কিন্তু আসলে মানুষটা যেন অন্য কোন্ চিন্তায় তলিয়ে গেছেন। আমাকে দেখছেন না আদৌ। দৃষ্টিটা আস্তে আস্তে সামনের ছবির ওই জীবন্ত রমণী-মূর্তির দিকে ঘুরল। নির্নিমেষে দেখতে লাগলেন। এত রাতে বাইরের স্তব্ধতা যেন ঘরের মধ্যে সেঁধোচ্ছে।

জবাব দিলেন, হ্যাঁ দেখা হয়েছিল। বিনায়কের সঙ্গে অশোক নাগেনের এক বছর বাদে মাত্র একদিনের জন্য দেখা হয়েছিল। কিন্তু তার ঢের ঢের আগে মাতিলদার জীবনের নাটক শেষ হয়ে গেছে। হিংস্র উল্লাসে বিনায়ক তার স্তব্ধ মুখের ওপর সেই নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছুঁড়ে দিয়ে গেছে।···হ্যাঁ, অশোক নাগেন যতটুকু জানে, তুমিও ততটুকুই জানবে।

বলতে বলতে কি এক অফুরন্ত বেদনা যেন চাপতে চেষ্টা করলেন শংকর আরডে। বয়ের প্রতীক্ষায় না থেকে নিজেই গেলাসে মদ ঢাললেন। সোডা না মিশিয়ে ঢকঢক করে গিলে ফেলে মুখ বিকৃত করলেন।

বিনায়ক তখন রাজস্থানে।

মাতিলদা সোজা সেখানে চলে এসেছে। এই রকমই কথা ছিল।

দিন তারিখ স্থির ছিল। বিনায়ক স্টেশনে উপস্থিত ছিল। সে জানত মাতিলদা আসবে। আসবেই।

ওকে দেখে একমুখ হাসি মাতিলদার। অপরাধের বা বিবেক-দংশনের লেশমাত্র নেই। বলল, দেখ আসব বলেছিলাম, ঠিক এসে গেলাম কিনা?

বিনায়ক মাথা নাড়ল। ঠিকই এসেছে। কিন্তু তার বুকের তলায় ঝড়। মাতিলদাকে বাড়ি নিয়ে গেল। আদর যত্নের ব্যবস্থা করল। কিন্তু কাজের অজুহাতে বাইরে বাইরে কাটাচ্ছে। রাতের ক্লান্তি আর অসুস্থতার অজুহাতে আড়াল নিয়েছে।

একে একে তিন দিন কাটল।

মাতিলদার মনের তলায় সংশয় দানা বেঁধে উঠতে লাগল। মুখও ধারালো কঠিন হয়ে উঠেছে। অসহিষ্ণু পায়ে সে রাতে নিজেই বিনায়কের ঘরে চলে এলো। ফুঁসে উঠল, তুমি এভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে যে?

ধড়ফড় করে শয্যায় উঠে বসল বিনায়ক। নিজের সঙ্গে কি বিষম বোঝা-বুঝি চলছে বুঝতে দিতে চায় না। বলল, পালিয়ে বেড়াচ্ছি কি রকম?

—কি-রকম তুমি জানো না? আমি এলাম, অথচ তিন দিনের মধ্যে তুমি কাছে আসছ না, আমাকে আদর করছ না—কি মতলব তোমার?

মাথার মধ্যে কি-যেন হচ্ছে বিনায়কের। নিজেরই হাতুড়ির ঘা বসাতে ইচ্ছে করছে। জিজ্ঞাসা করল, আমি কাছে আসি আদর করি, তুমি চাও?

—আমি চাই না। তুমি চেয়েছ। তুমি শর্ত করেছ। এক মাসের জন্য আমাকে কাছে পেলে তুমি আমাকে দশ হাজার টাকা দেবে বলেছ। আমাদের কথার খেলাপ হয় না, তোমাদের ভদ্র-লোকদের বুঝতে পারি না। আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুমি টাকা

দেবে কি দেবে না ?

স্নায়ুর রক্ত তেতে উঠছে বিনায়কের। একটা বুভুক্ষু যন্ত্রণা উগ্র হয়ে উঠছে। নিজেকে শাসনে রাখা যাচ্ছে না। অথচ আশ্চর্য, রমণীর এই অসহিষ্ণু মূর্তি এখনো নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক।

—বোসো। টাকা দেব। কিন্তু টাকা নিয়ে তুমি কি করবে ?

—টাকা নিয়ে কি করব তুমি জানো না ? দেরাদুনে এত কথা হয়ে গেল, আর এখন জিজ্ঞেস করছ টাকা দিয়ে কি করব ?

—জানি। কিন্তু সে-টাকা যদি অশোক না নেয় ?

—বা রে ! নেবে না কেন ?

—আর এরপর ফিরে গেলে তোমাকেও যদি না নেয় ?

—আমাকে নেবে না। মাতিলদা বিমূঢ় প্রথম একটু। তারপরেই ঝলসে উঠল, ইস্ আমাকে নেবে না ! কাঁধের ওপর মাথা থাকবে তার ! তার জন্যে এত করছি, তাকে টাকা দেব বলে এক মাসের জন্যে ছেড়ে এসেছি - সে নিজের মুখে বলেছে তোমাদের ভদ্রসমাজের ভালবাসা জিইয়ে রাখতে হলে টাকার দরকার হয়—বলেছে টাকা না থাকলে ভালবাসা মরে যায়, সব অন্ধকার হয়ে যায়—সেই টাকাই আমি নিয়ে যাব, তা হলে আর কথা কি ?

এতক্ষণে ভালো করে বিনায়কের মুখের দিকে চেয়ে মাতিলদা হেসে উঠল। কি-রকম মুখ হয়েছে যেন, কি-রকম করে যেন দেখছে ওকে। বলে উঠল, বুঝেছি, বন্ধুর ভয়ে তোমার এই দশা ! কিছু ভেবো না, আমি ফিরে গিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে ঠাণ্ডা করে দেব—তাছাড়া টাকা পেলে তার মেজাজও ভালো হয়ে যাবে।

হাসির ফলে মাতিলদার সাদা দাঁতের সারি ঝকমকিয়ে উঠল, বুক দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠল বিনায়কের মাথায়। দু-হাতে ওকে নিজের বুকের ওপর টেনে আনল।

ওর ওপর হিংস্র। নিজের ওপর হিংস্র। দুনিয়ার ওপর হিংস্র।

সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত বিবেক, সমস্ত সংস্কার এক দুর্বার প্রাপ্তির গভীরে নিঃশ্বেসে ডুবিয়ে দিতে চাইল। ডুবিয়ে দিল।

কটা দিন এক মত্ত নেশার মধ্যে কেটে গেল বিনায়কের। সে বিষ পান করেছে। কি বিষ, আর এক রমণীর তা অনুভব করার ক্ষমতা নেই। সেই বিষের যাতনায় বিনায়ক নিজে জ্বলছে। সেই জ্বালা দূর করার জন্য সেই বিষই দ্বিগুণ গ্রাস করছে। গ্রাস করে করে যাতনার চেতনা বিলুপ্ত করে দিয়েছে। এখন শুধু নেশা। সেই বিষের নেশা। বিষ ছাড়া তার এক মূহূর্ত চলে না, চলবে না যেন।

নাজেহাল হয়ে মাতিলদা ভ্রূকুটি করে, ধমকায়। বলে, তুমি একটা আস্ত রাক্ষস, আমাকে যেন একেবারে খেয়ে দেশ করে দিতে চাও।

ওর নড়া-চড়া দেখলে মাথায় আগুন জ্বলে বিনায়কের, হাসি দেখলে আগুন জ্বলে, কথা শুনলেও আগুন জ্বলে। দিনমানেই কাছে টেনে আনে।—আর অশোক ? সে কেমন ?

সে ? সে তোমার থেকে ঢের ভালো। তার তুলনায় তুমি একটা রাক্ষস। সে তো জানে আমি তার ভালবাসার মেয়ে। সে এরকম করবে কেন ? হাসে মাতিলদা, বলে, অবশ্য তুমিও খারাপ নও, আসলে তুমি জান এক মাস বাদে আর আমাকে পাবে না, তাই এমন দস্যি আর এত লোভী তুমি।

এই দস্যিপনা আর লোভ বাড়ছেই বিনায়কের। কাজ-কর্ম সব জলাঞ্জলি দিয়েছে। বিবেকের টুঁটি টিপে মেরেছে। এক মাস বাদে কি হবে ভাবতে গেলে বুকের তলায় মোচড় পড়ে। সেটা নির্মূল করার তাড়নায় পাগলের মতই ওই রমণীর যৌবন সাগরে ডুব দিতে চায়। ভাববে না, ভাববে না—এখন কিছুই ভাববে না। সেই কালান্তক সময় আসুক, তখন ভাববে।

দিন কয়েক বাদে বিনায়ক নিজেই প্রস্তাব করল, চলো জব্বলপুরে চলে যাই আমরা।

শোনামাত্র নেচে উঠল মাতিলদা।—চলো চলো, আজই—উঃ মনে হচ্ছে কতকাল দেশ ছেড়ে এসেছি। ভানরেও যাব, অ্যাঁ? তোমার বন্ধু ভীতু, ভয়ে ভানরে যেতে চায় না—অত ভয় কিসের, অ্যাঁ? কে কি করবে আমাদের! ভানরের সেই জায়গাটা আমি ভুলতে পারি না, যে জায়গায় তোমার বন্ধুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা—তোমাকে দেখাব'খন।

বিনায়ক হেসেছে। মাথা নেড়েছে। কিন্তু বুকের ভিতরটা চিন চিন করে জ্বলছে আবার।

জব্বলপুরে এসে মাতিলদার আনন্দের ছোঁয়া ওকেও স্পর্শ করেছে। খুশিতে ভরপুর মাতিলদা। এখানে এসেই ভদ্রলোকের পোশাক সরিয়ে ফেলেছে। সেই ঘাগরা আর কাঁচুলি পরেছে। বিনায়কের যখন আপত্তি নেই, তখন আর বাধা কি? খুশি হয়ে মাতিলদা বলেছে, ভালো লাগে না বাপু তোমাদের পোশাক, সর্বাঙ্গ ঢাকা, এতদিন হয়ে গেল আমার এখনো দম বন্ধ হয়ে আসে।

—তাহলে পরো কেন?

—না পরে কি করব? ওখানে তো এ-সব অচল।

—এখানেই থেকে যাও। আমি তোমাকে বরাবর এই পোশাকই পরতে দেব।

মাতিলদা হাসে। বলে, তুমি একটা পাগল। তাও কখনো হয়। এখানে তো আমি দিব্বি ফুর্তিতে আছি, কিন্তু ও লোকটার কথা মনে হলেই কষ্ট হয়। কিরকম ছটফট করছে আমিই জানি। কবে যে মাস ফুরবে·· তুমি আমাকে কিছুদিন আগেই ছেড়ে দাও না।

একথা শুনলেই ইদানীং হিংসেয় ভিতরটা কালি হয়ে ওঠে বিনায়কের। কিন্তু বাইরে বুঝতে দিতে চায় না। মাথা নেড়ে বলে উহুঁ, একদিনও আগে নয়।

তাকে নিয়ে মাতিলদা ভানরে গেছে কদিন। ওর অগোচরে

সঙ্গে রিভলবার নিতে হয়েছে। আদিবাসীদের কারো চোখে পড়লে কি বিপদ ঘটে ঠিক কি। না বিপদ ঘটেনি।• মাতিলদাই শুধু বিনায়কের বুকের তলায় ঝড় তুলেছে। সেই জায়গায় এসে খুশিতে ছোটাছুটি করেছে ছোট মেয়ের মতো। ওই পাথরটা তেমনি আছে। তার ওপরে বসেছে। স্মৃতির সুখে বিভোর। বলেছে, এখানে আমি এমনি করে বসতাম, আর তোমার বন্ধু দু'হাতে আমার কোমড় জড়িয়ে ধরে পায়ের কাছটিতে বসে থাকত।

বিনায়ক সেই রকম করে বসতে গেছে। তার আগেই ছিটকে উঠে দাঁড়িয়েছে মাতিলদা। বলেছে, না, তুমি না, তুমি আর সে এক লোক নাকি। সে একরকমের মানুষ, আর তুমি হলে একটা দস্যু, একটা পাগল। আমাকে একেবারে গিলে বসে থাকতে চাও।

হ্যাঁ, সেই রাতে নিষ্ঠুর আক্রোশে গিলতেই চেয়েছে তাকে। সকোপে মাতিলদা কতবার ওকে ঠেলে সরাতে চেয়েছে, ঠিক নেই। শেষে হাল ছেড়েছে।

মাতিলদার আনন্দ বাড়ছে। কারণ মাস শেষ হয়ে আসছে। আর বিষাদের গহ্বরে ডুবছে বিনায়ক। সামনের সব কিছু ধূসর পাণ্ডুর যেন। শুধু তাই নয়, ভিতরে ভিতরে অনাগত আতঙ্ক একটা। সামনে দুর্যোগ। সেটা কতবড় জানে না। শুধু জানে সে দুর্যোগ অমোঘ।

মাস ফুরোবার তিন দিন আগে থেকে অনুনয় বিনয় আকুতি শুরু হল তার, মাতিলদা যেও না, আমাকে ছেড়ে যেও না। দশ হাজার কেন, আমার জীবনের সর্বস্ব দেব তোমাকে—সেখানে আর ফিরে গিয়ে লাভ হবে না, তুমি আঘাত পাবে।

প্রথম প্রথম মাতিলদা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছে তাকে। বলেছে, পাগলামী কোরো না, আমি তো তোমাকে ভালবাসি না, তোমার বন্ধুকে ভালবাসি। তার টাকা চাই বলেই তোমার কাছে আসা। সে

কতদিন ধরে আমার পথ চেয়ে বসে আছে, আমারও আর এক মুহূর্ত ভালো লাগছে না তাকে ছাড়া।

সেদিন যেতে আরো বেশি আঁকড়ে ধরেছে তাকে। তার পর দিন আরো বেশি। যেতে দেবে না, বিনায়ক কিছুতেই যেতে দেবে না মাতিলদাকে।

ফলে ধৈর্য গেছে মাতিলদার। সেও রেগে আগুন। বলেছে, তুমি বেইমান। তুমি বন্ধুকে ভালবাসো না। এখান থেকে গিয়ে আমি আর তোমার মুখও দেখব না।

—কিন্তু আমি যদি টাকা না দিই তোমাকে ?

—কি ? কি ? কি বললে তুমি ? টাকা যদি না দাও ? প্রাণে ভয়-ডর নেই ? তোমার কলজে খুবলে টেনে বার করব না আমি।

শেষের সেই রাতে বিনায়ক তাকে কাছে ডাকে নি। মাতিলদাও যায়নি। রাতে তার ঘুম হয়নি। টের পেয়েছে ওই লোকটাও সমস্ত রাত তার ঘরে পায়চারি করেছে।

পরদিন।

সকালে বিনায়ক ঘরে ডেকেছে মাতিলদাকে।—তুমি যাবেই তাহলে ?

মাতিলদা ঝাঁঝিয়ে উঠেছে—কি মনে হয় ?

বিনায়ক জবাব দিল না। থমথমে মুখে চেয়ে রইল খানিক। তারপর আলমারি খুলল। কয়েক পাঁজা কড়কড়ে নোট এনে তার সামনে রাখল। বলল দশ হাজার আছে—

মাতিলদা গুণতে জানে না। তার মনে সন্দেহের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু এই লোক তার শেষের ক'দিনের ব্যবহারে সন্দেহের কারণ ঘটিয়েছে। জিজ্ঞাসা করল ঠিক আছে তো ?

মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থেকে মাথা নাড়ল। ঠিক আছে। তারপর বলল, আমার একজন বিশ্বস্ত লোক তোমার সঙ্গে যাবে, দেরাদুন পর্যন্ত—

কেন ?

—সঙ্গে এত টাকা আছে জানলে তোমাকে জানে মেরে দেবে।

—অত শস্তা নয়। আমি কাউকে চাই না!

বিনায়ক আবার চেয়ে আছে তেমনি। একটা কথা রাখবে ?

মাতিলদা চোখে চোখ রাখল। এই লোককে আর কোনো কথা দিতে রাজি নয় সে।

—গিয়ে যদি দেখো কোনরকম গণ্ডগোল হয়েছে, এখানে চলে আসবে ?

বিরক্তি চেপে মাতিলদা জবাব দিল, গণ্ডগোল হবে না।

তার অগোচরে সঙ্গে বিশ্বস্ত লোক পাঠালো বিনায়ক। কড়া নির্দেশ দিল, কোনো সময় যেন ওকে চোখের আড়াল না করে।

মাতিলদা চলে গেল।

বিনায়ক নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে।

মাতিলদা একবার ফিরেও তাকালো না।

পনের দিন কেটে গেল। যে লোককে সঙ্গে দিয়েছিল বিনায়ক তার দেখা নেই। অশান্ত, উদগ্রীব জীবনের অস্থিরতম মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে। নিজের মৃত্যু-তুল্য ঘোষণা শুনতেও রাজি, তবু যা হোক ফয়সালা একটা হয়ে যাক।

সতের দিনের দিন ফিরল সেই লোক। একলা। কোনো কথা না শুনে বিনায়ক জিজ্ঞাসা করল, মাতিলদা কোথায় ?

—সেও ফিরেছে। ভানরের দিকে গেছে। আমি তার পিছনে ঘুরছি জানতে পেরে আমাকে ছোরা নিয়ে তাড়া করেছিল।

তারপর যা শুনল, বিনায়কের কাছে অন্তত অপ্রত্যাশিত নয়। অশোক নাগেন দেরাদুনে নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না। তার বাড়িতে অন্য ভাড়াটে বাস করছে।

মাতিলদা শুনে বিশ্বাসই করল না প্রথম। কোনো বাধার পরোয়া না করে সেই বাড়িতে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। তারপর হতভম্ব একেবারে। বার বার বলতে লাগল, আমি কতদিন কত সেধেছি, এখান থেকে নড়তে চায়নি সে, একেবারে শিকড় গেড়ে বসেছিল—এর মধ্যে কোথায় চলে গেল? কোথায় যেতে পারে? কোথায় যাবে?

কোথাও গেছে তখনো বিশ্বাস করতে রাজি নয়। নিশ্চয় এখানেই আছে, তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। দেরাদুনের প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়িতে হানা দিয়েছে সে, কেউ তাকে ঠেকাতে পারেনি। প্রত্যেক আপিসে আপিসে ঢুকেছে, প্রত্যেক হোটেলে রেস্তোরাঁয় ঢুকেছে, তারপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এমন যে, কেউ তার কাছে ঘেঁসতে ভরসা করেনি। মেয়েটা বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে ভেবে সকলেই তফাতে সরেছে।

খাওয়া নেই, ঘুম নেই, অর্ধ-উন্মাদ অবস্থায় জব্বলপুরে ফিরেছে। কেউ কিছু বলতে গেলে ছোরা নিয়ে তেড়ে আসে। জব্বলপুর ফিরেই ভানর পাহাড়ের দিকে ছুটেছে।

বিনায়ক কি করবে এখন? এ-রকম যে হতে পারে সে-তো জানত—কি করবে এখন? এই এক মেয়ে যে তার সর্বস্ব কেড়েছে সেই যাতনাটাই বড় নয়—ওকে রক্ষা করবে কেমন করে?

সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে মাতিলদা এলো। সব শুনে সব জেনেও ওকে দেখে বিনায়ক চমকে উঠল। মাতিলদা নয়, মাতিলদার প্রেত। বারান্দায় একটা সোফায় গা ছেড়ে বসেছিল বিনায়ক, তেমনি বসে থাকল। বুকের তলায় কি হচ্ছে সেটা বুঝতে দিল না।

মাতিলদা সামনে এসে দাঁড়াল। দুই চোখে দুটো কয়লা জ্বলছে। চেয়ে আছে। দেখছে।

গলার স্বরেও আগুন ঝরল।—এ-রকম হতে পারে তুমি জানতে?

বিনায়ক জবাব দিল না। চেয়ে আছে।

—দেরাদুনে যখন আমার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে তোমার কাছে এসে এক মাস থাকতে বলেছিলে, দশ হাজার টাকা দেবে বলেছিলে, তখন তুমি জানতে আমাকে না পেয়ে তোমার বন্ধু এ-রকম পাগলের মতো দেশ ছেড়ে চলে যাবে? জানতে? জানতে?

বিনায়ক মাথা নাড়ল। জানত।

—আমাকে বলোনি কেন?

—তোমাকে পেতে চেয়েছিলাম বলে। তোমাকে আমি ওর থেকে বেশি ভালবাসি বলে।

—শয়তান! বেইমান! কোমর থেকে ঝকঝকে ছোরা বার করল একটা, তোমাকে আমি টুকরো টুকরো করে কাটব। দু'পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল। আরো নৃশংস কোনো প্রতিশোধের কথা মনে হল তার। বলল, আজ নয়, ও আসুক, দু'জনে মিলে জ্যান্ত মাটির নীচে পুঁতব তোমাকে।

—মাতিলদা, কিছু খাবে?

—খাব! হ্যাঁ খাব। আমার তো ভয়ানক খিদে পেয়েছে। অবসন্নের মতো সামনের সোফায় বসে পড়ল।

বিনায়কের আদেশে বাবুর্চি হন্তদন্ত হয়ে সেখানেই খাবার নিয়ে এলো। মাতিলদা গো-গ্রাসে খেল কিছুটা। তার পরেই উৎসুক।
—আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে ও পাগলের মতো আমাকেই খুঁজছে?

বিনায়ক জবাব দিল, তাই তো খুঁজছে!

অ্যাঁ? তাই? তাজা প্রাণের জোয়ার এলো যেন হঠাৎ। হেসে উঠল, তাই না? দেখো লোকটা কি বোকা, আমি ওকে খুঁজছি আর ও আমাকে খুঁজছে। তাহলে তো কাল হোক পরশু হোক একদিন না একদিন ভানরের ওই জঙ্গলে আসবেই—ওই জায়গাটা কখনো ভুলতে পারে! মাথা ঠাণ্ডা হলেই ওখানে আসবে, আসবে না?

বিনায়ক জবাব দিল, নিশ্চয় আসবে।

মাতিলদা নিশ্চিন্ত। খুশিতে আটখানা। বলল, তুমি একটা আস্ত শয়তান, কিন্তু তোমার ভালো কথা শুনলে তোমাকে ভালো লোকই মনে হয়। আমি তাহলে সেখানেই যাই—

—কোথায়?

—ভানরে।

—এই রাতে! রাতে কেউ সেখানে যায়, না রাতে কেউ আসতে পারে—ভালুক খেয়ে নেবে না?

—ভালুক আবার কোথায় দেখলে সেখানে?

—আজকাল এসেছে।

—রাত্রিতে কোথায় থাকব তাহলে?

—এইখানে।—

সংশয়ে চকচকে দু'চোখ থমকালো তার মুখের ওপর।—তুমি শয়তানী করবে না?

বিনায়ক মাথা নাড়ল, করবে না।

—আমার ধারে কাছে ঘেঁসবে না?

মাথা নাড়ল, ঘেঁসবে না।

—ঠিক আছে, তোমার বন্ধু যদি তোমাকে ক্ষমা করে তাহলে আমিও করব।

একে একে চার দিন গেল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ক্ষিপ্ত মেজাজে ফেরে ভানর থেকে মাতিলদা, এলো না, আজও এলো না। কাল আসতে পারে, কি বলো?

বিনায়ক মাথা নাড়ে।—খুব সম্ভব কালই আসবে।

ও যখন ভানরে যায়, বিনায়কের তিন-চারজন লোক দূর থেকে তাকে অনুসরণ করে। কখন কি বিপদ ঘটে, ঠিক নেই।

সেদিন বিপদের সূচনা দেখা গেল। ওই লোক ক'টার মুখে বিনায়ক শুনল, দু'-জন আদিবাসী লোক ভানরের সেই পাথরের

ওপর মাতিলদাকে দেখে ছুটে এসে তার হাত ধরে টানাটানি করছিল আর মাতিলদা ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেষ্টা করছিল তাদের ওপর। ওরা গিয়ে পড়তে লোক ছুটো জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

বিনায়ক তক্ষুণি স্থির করল, আর ওকে ভানরে যেতে দেওয়া হবে না। কিন্তু আটকাবে কি করে তাও ভেবে পেল না।

কিন্তু মাতিলদা কি তার মতলব টের পেয়েছিল?

বরাবরই বেশ দেরিতে ঘুম ভাঙে বিনায়কের। পরদিন বেলায় উঠে দেখে মাতিলদা নেই। চাকর বাকরকে জিজ্ঞাসা করে জানল, খুব ভোরে বেরিয়ে গেছে মাতিলদা।

মনের তলায় বিপদের ছায়া পড়ল তক্ষুণি। তিন চারজন লোক-সহ গাড়ি ছোটালো ভানরের দিকে। সঙ্গে বন্দুকও নিয়েছে একটা।

কিন্তু এমন রোমহর্ষক দৃশ্য দেখবে, কল্পনা করেনি। ভানর পাহাড়ের ওপর একদিকে বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছে মাতিলদা। নীচে তীর-ধনুক হাতে জনাবিশেক আদিবাসী। তারা ওকে নেমে আসতে বলছে, নয়তো তীর ছুঁড়বে বলে ভয় দেখাচ্ছে।

জবাবে হি-হি হি-হি করে বেদম হাসছে মাতিলদা, আর চিৎকার করে বলছে, তোরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবি? আমার ভালবাসার লোকের কাছে আমাকে যেতে দিবি না? ওই বুড়ো সর্দারের ভোগের মেয়ে হব আমি? ভালবাসার লোকের কাছ থেকে আমাকে তোরা ছিনিয়ে নিবি সে সাধ্য আছে তোদের? দেখ, দেখ আমি তার কাছে যেতে পারি কিনা, চেয়ে দেখ—

একটা আর্ত রব উঠল। এদিক থেকে বিনায়ক চোখ বুজে ফেলল। অন্য সকলে চোখ বুজে ফেলল। যা হবার মুহূর্তের মধ্যে হয়ে গেল।

স্তব্ধ মুহূর্ত অনেকগুলো।

হঠাৎ বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ শুনে আর অচেনা কতগুলো লোক দেখে আদিবাসীরা পালিয়ে গেল।

বিনায়ক নেমে এলো ঝরণা-জলার সামনে সেই পাথরটার দিকে।

পাথরটার সামনে তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে রমণীর দেহ।

দূরের আকাশে ভোরের আভাস।

আমি নিস্পন্দের মতো বসে আছি।

আমার পাশে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন শংকর আরডে। নিষ্পলক দুই চোখ সামনের ওই ছবিটার দিকে। সমস্ত মুখ লাল। মদের বোতলটা নিঃশেষ।

অনেকক্ষণ বাদে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এর কতদিন বাদে বিনায়কের সঙ্গে অশোক নাগেনের দেখা হয়েছিল?

রমণীর মূর্তির দিকে চোখ রেখেই জবাব দিল, ন'দশ মাস বাদে, অশোকের ইউ. পি'র বাড়িতে।

আমার গলার স্বর সদয় ছিল না খুব। আবার জিজ্ঞাসা করলাম —সব কথা শোনার পরে উদার হয়ে বিনায়ককে ক্ষমা করে দিলে?

আস্তে আস্তে মুখ ফেরালেন।—কি বললে?

—বলছি, বিনায়ককে আপনি ক্ষমা করলেন?

স্থির চোখে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। তেমনি গম্ভীর। তেমনি পাথর মূর্তি।—না, আমি অশোক নাগেনকে ক্ষমা করলাম। আমি পাথর ব্যবসায়ী শংকর বিনায়ক আরডে ওর জীবন নিতে গিয়েও ক্ষমা করে এসেছি···শেষ যেবারে আমি দেরাদুনে ওদের দেখতে যাই, অশোক নাগেন আমার দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে মুক্তি ভিক্ষা করেছিল, মাতিলদার কাছ থেকে ওর মুক্তির ব্যবস্থা করতে বলেছিল।

আমার গলা দিয়ে একটা নিঃশব্দ বোবা আর্তনাদ বেরিয়ে আসার উপক্রম।

শংকর বিনায়ক আরডে আবার ছবির ওই জীবন্ত মূর্তির দিকে চোখ ফেরালেন। তেমনি গম্ভীর। তেমনি পাথর মূর্তি।

নিষ্পলক বড় বড় চোখ দুটো শুধু অস্বাভাবিক চিকচিক করছে।

দুই

পাঠক ধরে নেবেন না একটা গল্প লেখার তাগিদে বাইশ বছর বাদে শেষে হরির দুয়ারে এসে তার সঙ্গে হঠাৎ এভাবে দেখা হয়ে গেল। হরির দুয়ারে বলতে হরিদ্বার। আর তার সঙ্গে মানে সুলক্ষণা দয়ালের সঙ্গে। খবরটা আমাকে দিয়েছিল ছেলেবেলার বন্ধু জয়ন্ত রঙ্গ। নতুন বয়সের কালে কোন রাজনীতি দলে ভিড়েছিলাম। হালকা গোছের ব্যাপার সেটা তবু উৎসাহ আর উদ্দীপনা কম ছিল না। জায়গাটা এলাহাবাদ। সর্ব ব্যাপারেই বেশ নিরাপদ গোছের পটভূমি। শাসক দলের সব কাজে প্রতিবাদের ঝড় তুললেও গর্দান যাবার ভয় ছিল না। এমন কি হাজত বাসের ঝুঁকিও যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতাম। বেকার জীবনের স্বল্প-মেয়াদী শৌখিন রাজনীতির অধ্যায় বললে যতটুকু বোঝায়। যুক্তির থেকে তর্কের ঝোঁক বেশি ছিল। শোনার থেকে শোনানোর।

জয়ন্ত রঙ্গ সেই সময়ের আর সেই দলের অন্তরঙ্গ একজন। পেশার ক্ষেত্রে এখনো সতীর্থই বলা চলে তাকে। ইউ-পি-র এক নামী কাগজের হোমরাচোমরা সাংবাদিক। বছরে দুই একবার কলকাতায় আসে। তখন দেখা হয়। মন-খোলা গল্প ও হয়। গেল মাসে এসেছিল। খবরের কাগজের মানুষ। প্রথমেই জোরদার খবর দেবার মতো করে বলল, মাঝে দিন কয়েকের জন্য হরদোয়ার বেড়াতে গেছলাম, সেখানে হর্ কী পিয়ারীর ঘাটে হঠাৎ তোমার সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা—

কার কথা বলছে বা কি বলছে ভেবে না পেয়ে আমি অবাক একটু।—আমার সুলক্ষণা সে আবার কে ?

চোখ পিটপিট করে জয়ন্ত বলল, ক্যা তাজ্জব কি বাত্—এলাহাবাদের সেই সুলক্ষণা দয়াল—কৃষ্ণকুমারের বোন—ভুলে গেলে? তোমার সেই ঝুমরি।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মগজের মধ্যে একটা ওলট-পালট কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। যার ফলে তখনো বোধ হয় হাঁ করে চেয়েই ছিলাম ওর দিকে। এবার হাল-ছাড়া গলায় চোস্ত উর্দুতে জয়ন্ত রঙ্গ রসিকতা করে উঠল, কি-রকম রসের কারবারী তুমি, যে মেয়ের মন পাবার জন্য আমাকে কাটতি দিয়ে গায়ে আতর মেখে দু-বেলা কৃষ্ণকুমারের বাড়ি পলিটিকস কপচাতে যেতে, আর হঠাৎ নিপাত্তা হয়ে যেতে যার খোঁজে তামাম এলাহাবাদ চষে বেড়িয়ে শেষে আমার গলা চেপে ধরলে—সেই পহেলী চিড়িয়াকে বেমালুম ভুলে মেরে দিলে।

ভুলিনি। বিস্মরণের পলস্তরা পড়েছিল। শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাইশ বছরের একটা ভারী পর্দা চোখের সামনে থেকে সরে গেছে। এক বাড়ির মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো সক্কলের গায়ের চামড়া চোখে লাগার মতো ধপধপে ফর্সা। সকলের মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ে। যার গায়ের রং ফর্সা নয়। তা বলে কালোও ঠিক নয়। কিন্তু বাড়ির লোকের পাশে কালোই দেখাতো। বাড়ির মানুষেরা তার গায়ের রং নিয়ে খুঁতখুঁত করত। কিন্তু সেই মেয়ের আয়তপক্ষ্ম নিবিড় কালো চোখের তারায় আমি যে আলো ঠিকরোতে দেখেছি, আর তার সুচারু দুই ঠোঁটের ফাঁকে যে অধরা। হাসির ঝিলিক দেখেছি, এই খুঁতখুঁতনির কথা শুনলে বাড়ির মানুষ-গুলোকে আমার অন্ধ মনে হত। কৃষ্ণকুমার অবশ্য বলত, ঝুমরির গায়ের রং একটু চাপা হলেও অমন রূপ কটা মেয়ের হয়। এরা সব মিথ্যে ভাবে, ওর খুব ভালো বিয়ে হবে আমি বলে দিলাম।

ঝুমরি বা সুলক্ষণা কৃষ্ণকুমারের মামাতো বোন। এ-বাড়ির সমাদরের আশ্রিত। বছর দুই আগে কলেজে পড়ার নাম করে বাপের বাড়ির সংশ্রব ছেড়ে এলাহাবাদে পিসির কাছে চলে

এসেছিল। কলেজে পড়ছিলও। কিন্তু পড়াশুনায় তেমন মতি আছে আমার মতো নীরব ভক্তও সে-কথা বলবে না। কৃষ্ণকুমার বলত, ঝুমরির মাথা খুব একটু পড়লেই ভালো রেজাল্ট করতে পারে, কিন্তু পড়তে ডাকলেই ওর গায়ে জ্বর আসে—

যেটুকু বলত তার থেকেও বেশি বিশ্বাস করতাম আমি। ঝুমরির মাথা খুব, বুদ্ধি খুব। এত বুদ্ধি আর এত মাথা বলেই যেন ওর নিয়ম করে কৃষ্ণকুমারের কাছে বই নিয়ে বসার দায়টাকে বড় কর্তব্য ভাবতাম না। ওর নাম সুলক্ষণা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবটুকুই যেন তাই। আবার সুলক্ষণার ভিতরটা যদি নদীর মতো খরস্রোতা হয় তাহলে ওই পোশাকী নাম ছেড়ে ঝুমরি নামটাই যেন সব থেকে মানায় ভালো। আমার চোখে ও আড়াল হলে সুলক্ষণা, সামনে এলে ঝুমরি।

বাড়ির লোকের অবিবেচনা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণকুমার ওর রূপের কথা তুললে ঝুমরি মিটিমিটি হাসত আর আড়ে-আড়ে আমাকে লক্ষ্য করত। আমার মুখ থেকে নীরব সমর্থন ভিন্ন কোনরকম মন্তব্য আশা করত না। দুই একটা কটাক্ষেই বুঝে নিত ভিতরে ভিতরে কতগুণ বেশি সায় দিলাম। তারপর আরও বেশি মজা পেত যেন। চোখের তারায় আর ঠোঁটের ফাঁকের হাসির ছোঁয়াটুকু আরও তীক্ষ্ণ মনে হত তখন। ফাঁক পেয়ে চাপা ঝাঁঝালো গলায় ঝিলিক তুলে একদিন আমাকে বলেছিল, আমার চেহারা নিয়ে কৃষ্ণদার তোমার কাছে মাথা ব্যথা কেন—আমাকে ভেতো বাঙালীর কাছে গছাবার মতলব নাকি!

জবাব হাতড়ে না পেয়ে হাসতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার বুকের তলায় যে ঝড় উঠেছিল সে-ও ওই মেয়ে ঠিকই আঁচ করেছিল মনে হয়।

কৃষ্ণকুমারের মনে মুখে লাগাম নেই। ঝুমরির দুঃখের খবরও শুনিয়েছে আমাদের। আর একই প্রসঙ্গে মামারও রূঢ় সমালোচনা

করেছে। মামার শিক্ষা-দীক্ষা আছে, কিন্তু স্বাভাব-চরিত্র ভালো নয়। হৃদয় বলেও কিছু নেই। মামীটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে অকালে চোখ বুজেছে। বছর না ঘুরতে মামা একটা বাজে মেয়ে-ছেলেকে বিয়ে করে ঘরে এনে তুলেছে। দু'জনে মিলে মেয়েটাকে নির্যাতন করত। কিন্তু ঝুমরি মায়ের মতো মুখ বুজে সহ্য করার মেয়ে নয়। স্কুলের পরীক্ষা সারা হতেই এক জামা-কাপড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। এলাহাবাদ থেকে খবর যেতে মারমুখী বাপ মেয়েকে শাসন করতে আর নিয়ে যেতে এসেছিল। সেই মামাকে কৃষ্ণকুমার বলতে গেলে ঘাড় ধাক্কা দিয়েই তাড়িয়েছে। রাজনীতিতে কৃষ্ণকুমার আমার থেকে অন্তত ঢের বেশি মাথা গলিয়ে-ছিল। টানা ছ-মাস জেলও খেটেছে একবার। তাছাড়া তখনো কাল রোগে ধরেনি তাকে। নীতিগত ব্যাপারে সেই নরম-সরম মিষ্টি ছেলেটার এক ধরনের অনাপোস মেজাজ ছিল। গো ছিল। ফলে আত্মীয় পরিজনেরা বেশ সমীহ করে চলত তাকে। মামা সেই যে প্রস্থান করেছে আর কোনদিন মেয়ের খোঁজও নেয়নি।

জয়ন্ত রঙ্গ খুব মিথ্যে ঠাট্টা করেনি। সুলক্ষণাকে নিয়ে ওর সঙ্গে বেশ একটা রেষারেষি ছিল আমার। বলত, মনে ধরলেই বা ইউ. পি-র মেয়েকে নিয়ে বাঙালীবাবুর কি আশা! সুলক্ষণার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখলে সামনে চোখ পিটপিট করত, আড়ালে বিচ্ছিরি করে হাসত। রাজনীতির আলোচনায় গলা চড়ালেই টিপ্পনী কাটত, ঝুমরি তো কাছেই বসে আছে, অত চেঁচিয়ে গলার শিরা ফোলানোর কি দরকার? ঝুমরির অনুপস্থিতিতে চুপ মেরে গেলেও জয়ন্ত হুল ফোটাতে ছাড়ত না। বলত, মেঘ দেখলে তবে ময়ুর নাচে। শ্রীমতী কাছে না থাকলে বাঙালী বাবুর জিভ নড়ে না। কৃষ্ণকুমারকে চুপি চুপি একবার সতর্ক ও করে দিতে চেষ্টা করেছিল শুনেছি। ঝুমরির ব্যাপারে আমার হাবভাব নাকি ভালো নয়। কৃষ্ণকুমার কানে তোলেনি। ঝুমরিকেই বলে দিয়েছিল। সে-কথা

শুনে ঝুমরির কি রাগ। আমাকে বলেছিল, ফাঁক পেলেই ও আমাকে কি জ্বালান জ্বালায় তোমরা তার খবর রাখো! কৃষ্ণদাকে বলি না বলে—

বললে খুশী হতাম। আমার হাবভাব যা-ই হোক তাতে কোন রকম নোংরামী ছিল না। তবু এ-কথা ঠিক, আচমকা অতবড় একটা অঘটন ঘটে না গেলে ওই মেয়েকে নিয়ে নিজের বাড়ির লোকের সঙ্গে বড় রকমের কোনো বিদ্রোহের সূচনা হত কিনা বলা যায় না। ঝুমরিকে নিয়ে আমি সম্ভব অসম্ভব অনেক রকমের কল্পনার জালে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

কৃষ্ণকুমারের ভবিষ্যত বাণী ঠিক হয়নি। ঝুমরির ভালো বিয়ে হওয়া দূরে থাক, এভাবে যে ও নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনতে পারে কেউ কল্পনাও করেনি। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই বিমূঢ় হয়ে গেছলাম আমরা। ওর বাড়ির লোকেরাও। এ আশ্রয় ছেড়ে, বিশেষ করে কৃষ্ণকুমারের মায়া ছেড়ে হঠাৎ এক রাতে ও নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে—এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড কে ভাবতে পারে? কৃষ্ণকুমারের অবস্থা তখন ভালো নয়। কাল ব্যাধি। গলা দিয়ে প্রায়ই রক্ত ওঠে। ঝুমরির তার জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। কৃষ্ণকুমারের বাবা ছিলেন গোঁড়া কবিরাজ। নাম যশও ছিল। গোঁ ধরে ছেলের কবিরাজী চিকিৎসাই চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর মতে আয়ুর্বেদের ওপর আর কোনো চিকিৎসা নেই। কৃষ্ণকুমারও তাই মেনে নিয়েছিল কিনা জানি না। নিজের চিকিৎসা নিয়ে বাপের ওপর কখনো কথা বলেনি। কিন্তু আমরা বলতাম। ঘর ছাড়ার দিনকতক আগেও ঝুমরি আমাদের ওপরেই ফুঁসে উঠেছিল, কৃষ্ণদাকে তোমরা এখান থেকে নিয়ে চলে যেতে পারো না? অন্য চিকিৎসা করাতে পারো না? কৃষ্ণদা মরতে চলেছে দেখেও বুঝতে পারছ না?

বুঝতে পেরেও আমরা কিছুই করিনি বা করতে পারিনি। কিন্তু

ঝুমরি এ কি করল? তার কৃষ্ণদাকে পর্যন্ত এতবড় আঘাত দিয়ে চলে গেল। শোনার পরও ও সত্যি কারো সঙ্গে স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে চলে গেছে এ কিছুতে বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না। ক্ষেপে গিয়ে কৃষ্ণকুমারের বাবা বার বার বলেছে, রক্তের দোষ। রক্তের দোষ যাবে কোথায়। বাপ যেমন মেয়ে তেমন। কৃষ্ণকুমারের মা বেচারীর লজ্জায় আর অপমানে মাথা নীচু। রক্তের দোষ বললে তারও লাগার কথা। নিজের ভাইয়ের মেয়ে, রক্তের যোগ তার সঙ্গেও আছে। ঝুমরির খোঁজে আমার ছুটোছুটি আর হয়রানি দেখে কৃষ্ণকুমারও শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই বলেছে, কোথাও পাবে না, যেখানেই যাক ও নিজের ইচ্ছেতেই গেছে। শুনে আমি দমে গেছি, কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। ঝুমরির মধ্যে কোন মন্দের ছিঁটেফোঁটাও আছে ভাবতে পারতাম না। হাসি-খুশি বুদ্ধিমতী মেয়েটা প্রয়োজনে তীক্ষ্ণ হতে পারে, কঠিন হতে পারে, সেটা বুঝতে পারতাম। বাপের কারণে হোক বা যে-কারণেই হোক ওর ভিতরটা যে খুব সুস্থির নয় তাও অনুভব করতে পারতাম। কিন্তু তা বলে ঝুমরির এমন মতি হবে, কৃষ্ণকুমার বললেও মন সেটা মেনে নিতে চায়নি। উল্টে বরং মনে হয়েছে বিপাকে পড়ে ঝুমরি হয়ত আমাকেই সব থেকে বেশি স্মরণ করছে। আমি আছি বলেই হয়ত তার উদ্ধারের প্রত্যাশা।

ফলে কৃষ্ণকুমার যা বলছে সেটা আমাকে বিচলিত করলেও মনের সায় মেলে নি। সন্দেহটা প্রথমে যার ওপর যোরাল হয়ে উঠেছিল সে এই জয়ন্ত রঙ্গ। ও যে রসিকতা করল তা অবশ্য করি নি। গলায় হাত দিই নি। তবে তার দিক থেকে গলদ কিছু থাকলে গলা যে কাটা যাবেই হাবভাব সেটা ওকে ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। বড়লোকের ছেলে। চটুল মতি। মুখের কথা খসালে ঝুমরির জন্য অনেক খরচ করত। প্রায়ই সিনেমা দেখাতে চাইত, রেষ্টুরেন্টে খাওয়াতে চাইত। ঝুমরি ওকে একেবারে

যে বাতিল করত তা নয়, কিন্তু আড়ালে বলত, পাজির পা-ঝাড়া একটা। কিন্তু আমি যদি কখনো বলি, ওকে প্রশ্রয় দাও কেন— ঝুমরি ফোঁস করে উঠেছে, বেশ করি, তোমার গায়ে জ্বালা ধরে কেন ?

ঝুমরির চোখের আগুন আর ঠোঁটের হাসির এই রীতি। আর আমার চোখে এও তার রূপ। ও নিখোঁজ হবার পর জয়ন্তকে ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেক জেরা করেছি। আর আড্ডা দেবার ছলে কম করে পনের দিন কড়া নজরে রেখেছি ওকে। ওকে সঙ্গে করেই ঝুমরির খোঁজে এলাহাবাদ চষেছি।

জয়ন্ত রঙ্গকে বাতিল করার পর আর একটা বাজে লোককেও সন্দেহ হয়েছিল আমার। তার নাম মধু যাদব। বিহারের লোক। জীবিকার তাগিদে কেমন করে কৃষ্ণকুমারের বাড়ি এসে জুটেছিল জানা নেই। ঝুমরি আসারও বছর দুই আগে থেকে ও-বাড়িতে ছিল সে। বয়সে আমাদের থেকে বছর তিনেক বড় হতে পারে। খাওয়া থাকা ছাড়া কৃষ্ণকুমারের বাবা সেই দিনে মাসে চল্লিশ টাকা মাইনে দিত ওকে। ফলে ঠিক চাকরের পর্যায়ে পড়ে না লোকটা। তবে বাড়ির লোক ফরমাশ করলে মুখ বুজে চাকরের কাজও করত। আর ঝুমরি বললে তো কথাই নেই। মুখের কথা খসালে গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে আসবে। আড়ালে-আবডালে আমরা ঠাট্টা করতাম সীতাদেবীর হনুমানের মতোই সুলক্ষণার ভক্ত হনুমান মধু যাদব। শুনে ঝুমরিও হাসত খুব। কখনো বলত, দাঁড়াও বলছি ওকে।

লোকটার গায়ের জোর কখনো পরখ করে দেখার সুযোগ হয় নি। তবে দেখলেই মনে হত অসুরের শক্তি রাখে। ঝুমরি উসকে দিলে আমাদের ধড় থেকে মাথা ছিঁড়ে নেওয়াও ওর পক্ষে অসম্ভব নয় হয়তো। মিসকালো গায়ের রং। খুব লম্বা নয়। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, ড্যাবডেবে দুটো চোখ। সে চোখে পলক পড়তে দেখা যায় না বড়। মুখের দিকে চেয়ে থাকলে অস্বস্তি হয়। ওর মধু

নাম একটা বিত্তিকিচ্ছিরি রসিকতা যেন।

ওর আসল কাজ কবিরাজির মালমশলা সংগ্রহ করা আর ওষুধ বানানোর ব্যাপারে কৃষ্ণকুমারের বাবাকে সাহায্য করা। বনবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে ওষুধের শিকড়-বাকড়, লতাপাতা, ফলমূল যোগাড় করে আনে। কোন্ জিনিসগুলো মনিবের বেশি দরকার এক বছরে ভালই বুঝে নিয়েছে। ওর অপলক ড্যাবডেবে চাউনির কথা উঠলে কৃষ্ণকুমার হেসে বলত, ওর চোখ আছে, বাবা একবার যা ওকে দেখিয়ে দেয় সহজে ভোলে না। ঠিক চিনে নিয়ে আসে। কৃষ্ণকুমারের বাবা শুধু বিচক্ষণ নয়, টাকা কড়ির ব্যাপারেও বেশ একটু হাত-টান আছে। তা সত্ত্বেও ভদ্রলোক সেই দিনে খাওয়া পরার ওপরে মাসে চল্লিশ টাকা মাইনে ওকে দেন সেটা আঁচ করা যেত। বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মধু যা সংগ্রহ করে আনত সে-সব আর বাজার থেকে কিনতে হত না। ফলে অনেক সাশ্রয় হত। তারপর সেসব বাছাবাছি করে ধুয়ে শুকিয়ে গুঁড়িয়ে পিষিয়ে কবিরাজ মশায়ের হাতের কাছে এনে মজুত করা কম ধকলের ব্যাপার নয়। কিন্তু মধু যাদব অনায়াসেই তা করত। যেন কলের মানুষ একটা, যন্ত্রের মতোই খাটতে পারে।

এ-হেন মানুষের একটু রসজ্ঞানের পরিচয়ও আমরা পেতাম আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতাম। সুলক্ষণা বা ঝুমরির গানের গলাটি ভালো ছিল। যেমন লোকই হোক, গান-বাজনার প্রতি ঝোঁক ছিল ওর বাবার। মাস্টার রেখে মেয়েকেও একটু আধটু শেখাতে চেষ্টা করেছিল। এখানে আসার পর কৃষ্ণকুমার সে-ব্যবস্থা বাতিল হতে দেয়নি। সামান্য মাইনেয় তার খাতিরের এক বুড়ো ওস্তাদের বাড়ি গিয়ে ঝুমরি গান শিখত। মাঝে মাঝে ওস্তাদও বাড়িতে আসতেন। কৃষ্ণকুমারের বাবা ওই কটা টাকাই বাজে খরচ ভাবত। কিন্তু ছেলের ব্যবস্থা নাকচ করার সাহস তার ছিল না। কিন্তু এই গান শেখার ব্যাপারেও ঝুমরির খুব যে একটা

নিষ্ঠা ছিল তা নয়। তবে ওর গলা মিষ্টি, আর গানের ঢংটুকু আমার চোখে অন্তত আরো মিষ্টি। মেজাজ এসে গেলে গান গাইতে গাইতে অল্প অল্প দুলত, কালো চোখের গভীরের হাসির ছোঁয়াটুকু তখন অদ্ভুত মায়াচ্ছন্ন মনে হত। ঝুমরির গানের সব থেকে সেরা আর নীরব ভক্ত ছিল বোধকরি মধু যাদব। বাইরের অন্ধকার দাওয়ায় একখানা পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ বসে যতক্ষণ গান চলত ওর নড়াচড়া নেই। সে-সময় কেউ কোনো ফরমাশ করলেও একদম কালা বনে যেত। নেহাত বাড়ির কর্তা বা কর্ত্রীর ডাক না পড়লে দাওয়া থেকে ওকে নড়ানো যেত না। আগে শুনেছি, ঝুমরির গানের সময় ও নাকি দরজার সামনেই এসে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। ঝুমরি নিষেধ করার পর আর দাঁড়ায় না। নিষেধ না করে উপায় কি, চোখের ওপর ও-রকম সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকলে ঝুমরির হাসি পেয়ে যায়।

ঝুমরি বাড়ি থেকে নিখোঁজ হবার মাত্র তিন সপ্তাহ আগে এই মধু যাদবকে বাড়ি থেকে তাড়ানো হয়েছিল। তার আগে দস্তুর মতো থানা পুলিশ করা হয়েছিল ওকে নিয়ে। চুরির ব্যাপার। ঝুমরির হার চুরি। সে-চুরি ঝুমরি বলতে গেলে স্বচক্ষেই দেখেছে। ওর মায়ের হার। মায়ের স্মৃতি। ওটার ওপর যে ঝুমরির অত মায়া জানতাম না। আমার ধারণা মধুকে তলায় তলায় একটু স্নেহই করত ও। কিন্তু হার খোয়া যাওয়া আর প্রায় হাতে-নাতে ধরা পড়ার পরেও মধুকে অস্বীকার করতে দেখে ঝুমরি রাগে ঠক ঠক করে কাঁপছিল। দু'চোখে আগুন ছুটেছিল। বাথরুম থেকে সবে স্নান সেরে বেরিয়েছে। হারটা খুলে তাকের ওপর রেখেছিল। ওটা ফেলে এসে নিজের ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়াতেই চোখে পড়েছে গলায় হার নেই। তক্ষুনি আবার ফিরে আসতে দেখে বাথরুমে মধু কলের নিচে বালতি বসিয়েছে। মনিবের স্নানের জল রোদে দেবে। বাথরুমের দারগোড়া থেকেই ঝুমরি দেখে তাকের ওপর হারটা

নেই। ধরেই নিল, হার পড়ে আছে দেখে মধু তাকে দেবার জন্যেই নিয়েছে। হাত বাড়িয়ে বলেছে, দাও—।

জবাবে মধু ড্যাব ড্যাব করে মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু।

বিরক্ত হয়ে ঝুমরি আবার বলেছে, কি হল, হারটা দাও?

এবারে মধু নিজে থেকেই ঘুরে দেয়ালের তাকটা দেখেছে। তারপর তার দিকে ফিরেছে আবার অপলক চাউনি, মুখে কোন ভাব-বিকার নেই।

ঝুমরিকে সহিষ্ণু মেয়ে কেউ বলবে না। ঝাঁঝিয়ে উঠল, হাঁ করে দেখছ কি চেয়ে, ওই তাক থেকে তুমি হারটা তোলোনি?

মধু মাথা নেড়েছে। তোলেনি।

আর যায় কোথায়। ঝুমরির মাথায় রক্ত উঠে গেল। সে চেঁচিয়ে উঠল, চালাকি পেয়েছ? এক মিনিট হয়নি আমি ঘরে গেছি আর এসেছি, এর মধ্যে তুমি ছাড়া আর এখানে কে ঢুকেছে? হারটা আকাশে উড়ে গেল? ভালো চাও তো এক্ষুনি দিয়ে দাও।

মধু আবার মাথা নাড়ল। সে নেয়নি, অথবা সে কিছু জানে না।

ক্ষিপ্ত হয়ে ঝুমরি পিসির কাছে ছুটল। বাড়িতে এ-সময় ঝি-চাকর কেউ নেই। এর মধ্যে একমাত্র পিসি যদি বাথরুমে ঢুকে থাকে আর হার তুলে থাকে। যদিও জানে তা হতে পারে না, কারণ পিসি তখন রান্নায় ব্যস্ত। মোটা শরীর নিয়ে তার রান্নাঘর থেকে এ-পর্যন্ত আসতেই দু-চার মিনিট লাগার কথা।

যা ভেবেছিল তাই। পিসিও শুনে আকাশ থেকে পড়ল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঝুমরি আবার এদিকে ছুটে এলো। সেই সঙ্গে হাঁক-ডাক করে আমাদেরও ডাকল। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যেই বাথরুম ছেড়ে মধু হাওয়া। সব শুনে আমরা স্তম্ভিত। বাড়িতে আর কাক পক্ষী নেই। এক মিনিটের মধ্যে ফিরে গিয়ে ঝুমরি ওকেই দেখেছে বাথরুমে। হারের খোঁজ নেবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা তাদের দিকেও তাকিয়েছে বোকার মতো। অর্থাৎ যেখানে

হার ছিল সেখানে আপনা থেকেই চোখ গেছে। আর ধরা পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে বালতি ফেলে ও নিখোঁজ। ও যে হার নিয়েছে তাতে আর সন্দেহের কি থাকতে পারে? কিন্তু আমরা আরো হতবাক এই কারণে, মধু শেষ পর্যন্ত ঝুমরির জিনিস চুরি করতে পারে এর থেকে অবিশ্বাস্য আর যেন কিছু নেই। আর ঝুমরিরও হয়তো এত রাগ সেই কারণেই। তলায় তলায় ওই লোকটাকে সে নিজের দাসানুদাস ভাবত। রাগে জ্বলে জ্বলে বার বার বলতে লাগল, এই চুরি একরকম স্বচক্ষেই দেখেছি আমি—যখন চাইলাম তখন হার ওর কাছেই ছিল—বোকার মতো মামীর কাছে ছুটে যেতেই হার সরানোর জন্য ও চোখে ধুলো দিয়ে গেল।

বেশ একটা উত্তেজনার হাওয়া থিতিয়ে উঠল বাড়িতে। কৃষ্ণ-কুমারের বাবাও সব শুনে স্তম্ভিত। কৃষ্ণকুমারও নির্বাক। মোট কথা, মধু এ-রকম কাজ করতে পারে কারো কল্পনার মধ্যে ছিল না।

বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। আধ-ঘণ্টার মধ্যে ও মূর্তি নিজেই এসে হাজির আবার। তেমনি ড্যাবডেবে চাউনি, ভাবলেশ-শূন্য মুখ। এ-রকম বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বাড়ির কর্তা অর্থাৎ কৃষ্ণকুমারের বাবাও অগ্নিমূর্তি। সে আসার সঙ্গে সঙ্গে হুমকি দিয়ে উঠলো হার বার কর্।

মধু মাথা নাড়ল। নেয়নি বা জানে না।

কর্তা ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল গালে। —নিস নি তো হার গেল কোথায়? বার কর্ শিগগীর।

কালো মুখে চড়ের লালচে দাগ পড়ে গেল। চুপচাপ কর্তার মুখের দিকেই চেয়ে রইল সে।

কর্তা গর্জে উঠলো, এই আধঘণ্টা কোথায় ছিলি তুই? কোথায় গেছলি?

মধু জবাব দিল, দিদিমণি চোর বলাতে দুঃখ হল, তাই বাগানে বসেছিলুম।

এর মধ্যে আমরা ওর খোঁজে বাগানে ঘুরে এসেছি। এই মিথ্যেও হাতে-নাতে ধরা পড়ল। অব্যক্ত রাগে হাত আমাদেরও নিশপিশ করছিল। কিন্তু আমাদের চেঁচামিচির জবাবে ও যেভাবে তাকাচ্ছিল, এতবড় অপরাধের পরেও কি জানি কেন গায়ে হাত তোলার সাহস আমাদের হল না।

কর্তাই আরো কটা চড়চাপড় বসালো, অনেক ভয় দেখালো, ভালো কথায় হার ফেরত দিতে বললো, কিন্তু মধুর কানে তুলো পিঠে কুলো। শেষে পুলিশে খবর দেওয়া হল। তারা ওকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে তিন দিন আটকে রেখে অনেক জেরা করল, মারের চোটে হাড় গুঁড়িয়ে দেবার উপক্রম করল, কিন্তু কবুল করাতে পারল না। ফলে ছেড়ে দিয়ে ওর ওপর চোখ রাখার মতলব ফাঁদল তারা। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বাড়ির দাওয়ায় না এসে মধু সোজা বাগানে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। রাতে খেতেও এল না। কেউ ডাকেও নি ওকে। পরদিন ভোরে ওর আর টিকি দেখল না কেউ। আবার পুলিশে খবর গেল। কিন্তু পুলিশও আর তার নাগাল পেল না।

মধু যাদবের অধ্যায় এখানেই শেষ। আর কখনো কেউ তাকে এলাহাবাদেই দেখেনি। মায়ের স্মৃতি ঝুমরির সেই হার খোয়া যেতে আমাদেরও একটু দুঃখ হয়েছিল বটে, কিন্তু ওই মূর্তি বিদেয় হবার ফলে এক ধরনের স্বস্তি বোধ করেছিলাম। লোকটা যেন জানত, অসুখের দরুণ কৃষ্ণকুমারকে সঙ্গ দিতে আসা, বা রাজনীতি আলোচনার লোভে এ-বাড়িতে ছুটে-ছুটে আসার লোভটাই সব নয়, এ ছাড়াও আরো কিছু বাড়তি আকর্ষণ আছে। ভাবলেশশূন্য মুখে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থেকে ও যেন এটুকুই ভালো করে বুঝিয়ে দিত আমাদের। এমনও মনে হয়েছে, কখন না জানি টুঁটি টিপে ধরে সোজা যমের দোর দেখিয়ে দেয়।

এই লোক গেছে আপদ গেছে।

মধু যাদব বিদেয় হবার তিন সপ্তাহের মধ্যে সুলক্ষণা উধাও। আগের দিনও তাকে দেখেছি, কথা বলেছি। আমাদের মনে এতটুকু খটকা লাগার মতো কোনো কারণ ঘটেনি। ওর হাব-ভাব আচরণের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি আমাদের। কেবল শেষের দিন দশ-বারো কৃষ্ণকুমারের সেবাযত্ন বেশি করছিল। আর, একটা জলজ্যান্ত লোক বাপের চিকিৎসার দম্ভের চোটে কোন্ খেয়া পাড়ি দিতে চলেছে, অথচ আমরা চোখকান বুজে বসে আছি— ইদানীং সেই ঝাঁঝের কথাও একটু বেশি শোনা যাচ্ছিল। এর কোনোটাই ও-মেয়ের ভিতরের কোনো মতলবের নজির নয়। তাই খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হকচকিয়ে গেছি, দিশেহারা হয়েছি। কৃষ্ণকুমারেরও একই রকম অবস্থা প্রথম। তারপর হঠাৎ কি রকম যেন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। বিবর্ণ পাংশু মুখ। তার পাশে বসেই তার বাবার তর্জন-গর্জন শুনেছি। স্ত্রীর মানসিক অবস্থা দেখে ভদ্রলোকের মেজাজ আরো বেশি তপ্ত। চিৎকার করে থেকে থেকে এক কথাই বলছিলো। —কার জন্য এমন হা-হুতাশ করছ, কি জন্য খবর করতে বলছ? যে মেয়ে এভাবে মুখে চুন-কালি দিয়ে চলে গেল, খুঁজে পেতে তাকে ধরে এনে আবার ঘরে ঢোকাব? একেবারে মুখ বুজে বসে থাকো, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে বাপের বাড়ি চলে গেছে। গেছে কিনা তোমার ভাইকে একটা চিঠি লিখে দেখতে পারো। যাক না যাক, এখানে আর জায়গা হবে না এ-ও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিও।

এ-ঘরে বসে সবই শোনা যাচ্ছিল। বিমনার মতো কৃষ্ণকুমার আমার মুখের দিকেই চেয়েছিল। একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, ঝুমরি সেখানে যায়নি, যেতে পারে না।

কৃষ্ণকুমারের বিবেচনার ওপর আমার অটুট আস্থা। সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্ভাবনা আমিও বাতিল করেছি। আর তিন দিনের মধ্যে খবরও এসেছে ঝুমরি সেখানে নেই। সেখানে যায়নি। কিন্তু

কৃষ্ণকুমারের বাবার কথার মধ্যেও সত্যের ছিটে-ফোঁটা আছে বলে ভাবিনি। নিজের এত বড় সর্বনাশ ঝুমরি স্বেচ্ছায় ঘটাতে পারে না। বড় রকমের অঘটন ঘটে গেছে কিছু। চরম কোনো বিপদে পড়ে ঝুমরি হয়তো নিঃশব্দে আর্তনাদ করছে, হাহাকার করছে। ঝুমরির চোখে যে আগুন জলে, নরক-যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে দিবা-রাত্র এখন হয়তো সেই আগুনই জ্বলছে। কৃষ্ণকুমারের বাবার কথা শুনে উল্টে ভদ্রলোককে নির্মম নিষ্ঠুর মনে হয়েছে আমার। চেনা-জানা মুখগুলো আঁতিপাতি করে খুঁজেছি তারপর। কে হতে পারে? ঝুমরির এত বড় সর্বনাশ কে করতে পারে?

জয়ন্ত রঙ্গ খুব একটা জোরালো লোক নয়। কিন্তু বাপের টাকার জোর আছে। ঝুমরিকে ঘিরে ওর বাসনার আঁচও টের পেতাম। বাসনা বেপরোয়া হয়ে উঠলে মানুষ অমানুষ হতে কতক্ষণ। তাছাড়া এ-পর্যন্ত তার দেখা নেই কেন? এ-পর্যন্ত বলতে পরদিন এই সকাল পর্যন্ত। সব দিনের মতোই ঝুমরি খেয়ে দেয়ে কলেজ গেছল। সেই কলেজ থেকে আর ফেরেনি। একটা রাত কেটে গেছে। পরদিন সকাল ন'টায় কৃষ্ণকুমারের কাছে এসে দেখি, নির্বাক বিবর্ণ মুখ। বাড়ির হাওয়া থমথমে। কিছু বোঝার আগেই কৃষ্ণকুমার বিড়বিড় করে বলেছে, ঝুমরি আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, কাল কলেজ থেকে আর বাড়ি ফেরেনি।

খবরটা এমন আকস্মিক যে আমার বুঝতেই সময় লেগেছিল। ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকেই চেয়েছিলাম আমি। কৃষ্ণকুমার আবার বলল, কলেজে খোঁজ করা হয়েছিল, ঝুমরি কাল কলেজে মোটে যায়ই নি।

আমি হতভম্ব। বুকের তলায় ঠক-ঠক কাঁপুনি ধরেছিল। ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ঘরে ফিরেছে কৃষ্ণকুমারের বাবা। গনগনে ধারালো মুখ। ছেলের মুখের ওপর একটা বিরক্তির ঝাপটা মেরে ভিতরে চলে গেছে। তারপর ভিতর থেকে ওই তর্জন-গর্জন শোনা গেছে।

ঝুমরি বাপের বাড়ি যায়নি, যেতে পারে না, কৃষ্ণকুমারের মুখে এ-কথা শোনার পর আর বেশিক্ষণ ওর কাছে বসে থাকতে পারিনি। জয়ন্ত রঙ্গর চপল মুখ বার বার চোখের সামনে এগিয়ে আসছিল। সাইকেল নিয়ে সোজা তার বাড়ি ছুটেছি। ধমনীর রক্ত তখন টগবগ করে ফুটছে। আমার সবুজ পৃথিবী নিমেষে বর্ণশূন্য হয়ে গেছে। সেই রিক্ত আগুন-ঝরা পৃথিবীর এখন ভেঙ্গে ফেটে চৌচির হবার প্রতীক্ষা শুধু।

কিন্তু দিন-কয়েক যেতেই বোঝা গেছে জয়ন্ত রঙ্গ নয়। ওর সেই সাহস নেই, সেই মেরুদণ্ড নেই। তারপরে আরও মনে হয়েছে, জয়ন্তর মত ছেলেকে ঝুমরি অনায়াসে নিজেই টিট করতে পারে। ওর ওপর দখল নিতে পারে এমন মরদ এই ছেলে নয়।

জয়ন্ত রঙ্গকে বাতিল করার পরে চকিতে আর একটা সন্দেহ মনে এসেছে আমার। আর তক্ষুনি সেই সম্ভাবনাই অবধারিত মনে হয়েছে। এর ঢের আগেই ঝুমরির বাপের বাড়ি থেকেও খবর এসেছে সে সেখানেও যায় নি। তাহলে?

তাহলে মধু যাদব। একমাত্র সে ছাড়া কার আর এত বড় দুঃসাহস হতে পারে। হার চুরি দূরের কথা, আমার বদ্ধ ধারণা অনায়াসে ওই শয়তান মানুষও খুন করতে পারে। একটাও স্নায়ু কাঁপবে না, একটুও হাত কাঁপবে না। সে ভিন্ন বাড়ি ছাড়ার মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে এতবড় অঘটন ঘটে কি করে? এই পৃথিবীতে ঝুমরির ওপরেই তো সব থেকে বেশি রাগ তার। ওর জন্যই পুলিশ তাকে তিন দিন থানায় আটকে বেদম মার মেরেছে। সে-মারের এ-রকম প্রতিশোধ একমাত্র এই লোকই নিতে পারে। তা ছাড়াও আমার স্থির বিশ্বাস ঝুমরিকে নিয়ে প্রথম থেকেই খারাপ মতলব ছিল ওর। ঝুমরি যদি সীতা দেবী হয়, ও তার হনুমান নয়। রাবণ। এ-কাজ ওর ছাড়া আর কারো নয়।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় আগুন জ্বলেছে। আবার অসহায়ও

বোধ করেছি কেমন। ওই নৃশংস মানুষটার কবল থেকে ঝুমরির মুক্তির আশা দুরাশাই বুঝি।

…কিন্তু এ-সম্ভাবনার কথা কৃষ্ণকুমারের বাবা মায়ের মনে এল না কেন? বিশেষ করে কৃষ্ণকুমারের মাথায় এল না কেন? থানায় খবর নিয়ে মধুর নামে হুলিয়া বার করা হল না কেন? এখনো সময় আছে। কৃষ্ণকুমারের কাছে ছুটে এলাম আমি।

সন্দেহের কথা শুনে কৃষ্ণকুমার চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। এতটুকু উত্তেজনার আভাষ না পেয়ে উল্টে অবাক। একটু বাদে ও ক্লান্ত স্বরে জবাব দিল, তা নয়, ঝুমরি নিজের ইচ্ছেতে অন্য কারো সঙ্গে চলে গেছে।

অবিশ্বাসের সুরে আমি জোর দিয়ে বলে উঠলাম, তুমি কি করে জানলে? এ হতেই পারে না—আমি এক্ষুনি থানায় গিয়ে যা করার করে আসি।

কৃষ্ণকুমার আবার খানিক চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ আমাকে নিষেধ করল। তারপর আস্তে আস্তে যে কথাগুলো বলল, শুনে ভয়ানক দমে গেলাম আমি। …সেদিন সকালে কলেজ যাবার আগে পর্যন্ত ঝুমরি নাকি প্রায় সারাক্ষণ কৃষ্ণকুমারের কাছেই ছিল। এগারোটায় কলেজ, সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত। তার সেবা-যত্ন করেছে, নিয়ম করে ওষুধ-পত্র খাওয়া আর সময়ে ঘুমানোর ব্যাপারে পাকা গিন্নীর মত উপদেশ দিয়েছে। বেলা সাড়ে দশটার সময় উঠে গিয়ে সামান্য কিছু নাকে-মুখে গুঁজে কলেজ যাবার জন্য তৈরি হয়ে আবার ঘরে এসেছে। বলেছে, মাথাটা একটু তোলো দেখি—

কিছু না বুঝেই কৃষ্ণকুমার উঠে বসেছিল। বলা নেই কওয়া নেই ঝুমরি তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একটা প্রণাম সেরে নিল। অবাক হয়ে কৃষ্ণকুমার জিজ্ঞাসা করেছে, কি ব্যাপার রে, পরীক্ষা-টরীক্ষা কিছু নাকি?

ঝুমরি হেসেই জবাব দিয়েছে, দারুণ পরীক্ষা, জীবন-মরণ নির্ভর একেবারে।

হাসতে হাসতে চলে গেছে।

বেদনা-বিবর্ণ মুখে কৃষ্ণকুমার বলেছে ও আর ফিরবে না জেনেই প্রণাম করে গেছে, আর ওই কথা বলে গেছে। তারপর কৃষ্ণকুমার ওর কলেজের দু'জন পরিচিত শিক্ষয়িত্রীকে ডেকে খবর নিয়েছে। পরীক্ষা-টরীক্ষা কিছুই ছিল না সেদিন। তাদের মুখ থেকেই শুনেছে, পাঁচ সাত দিন আগে থেকেই মাঝে মাঝে ক্লাস পালানো শুরু করেছিল ঝুমরি। ওই শিক্ষয়িত্রীদের একজনের মেয়ে ঝুমরির সঙ্গে পড়ে। সে নাকি তার মা-কে বলেছে, একটা মস্ত ঝকঝকে, বিলেতি গাড়িতে একজনের পাশে বসে ঝুমরিকে এখানে সেখানে যেতে দেখেছে। কলেজের অনেক মেয়েই দেখেছে।

আমার মুখে আর একটি কথাও সরেনি। কৃষ্ণকুমারকে আর কোনো সান্ত্বনার কথা বলতে পারিনি। নিজের বুকের তলায় যে কাটা-ছেঁড়া চলেছিল তাও প্রকাশ করতে পারিনি। কৃষ্ণকুমারদের বাড়ি আসাই কমিয়ে দিয়েছিলাম এর পর। একটা মেয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে বলে নয়, কৃষ্ণকুমারের মুখখানা বড় বেশি অসহায় আর করুণ মনে হত। মেয়েটা যেন ওর জীবনের শেষ সল্‌তেটা নিভিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

বিতৃষ্ণা-ভরা একটা আক্রোশ নিয়েই সেই মেয়েকে আমি মন থেকে ছেটে দিচ্ছিলাম। কিন্তু মাঝে-সাঝে চেনা-পরিচিত মুখের মারফৎ দুই একটা খবর কানে আসত। সুলক্ষণা দয়ালকে কখনো লক্ষ্ণৌর অমুক অভিজাত হোটেলে দেখা গেছে, কখনো বেনারসে কখনো বা আলমোড়ায়। আমার মনে হত ওই রসের খবর যারা দিচ্ছে তলায় তারা মুচকি-মুচকি হাসছেও। আমাকে বিঁধতে চায়। কিন্তু আমি আর বিদ্ধ হতে রাজী নই। কে সুলক্ষণা দয়াল তাই যেন চট করে মনে পড়ত না আমার।

কিন্তু ঘর ছাড়ার ঠিক একবছর দু'মাস বাদে এক বিজাতীয় আক্রোশে ঐ সুলক্ষণা দয়ালকেই মনে মনে সব থেকে বেশি খুঁজেছিলাম আমি। কৃষ্ণকুমার মারা গেল। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে ওর শূন্য দুচোখ একবার ঘরের মধ্যে চক্কর খেয়ে কাউকে যেন খুঁজেছিল। এর পরেই যদি সুলক্ষণা দয়ালের দেখা পেতাম কোথাও আর এ-খবরটা যদি সকলের আগে হেসে-হেসে তার কানে তুলে দিতে পারতাম।

বাইশ বছর বাদে জয়ন্ত রঙ্গর মুখে আবার সেই সুলক্ষণা প্রসঙ্গ। এবার গোড়ায় হঠাৎ ঠাওর করতে না পারাটা ভনিতা কিছু নয়। বাইশ বছর গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে, বুকের তলায় অনেক নরম জায়গায় শুকনো চড়া পড়ে গেছে। কিন্তু মানুষের একটা বয়েস চিরকালই বোধহয় নিজের অগোচরে কোনো এক জায়গায় আটকে থাকে। বিস্মৃতির পর্দাটা সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আগের দিনের মতোই নাড়াচাড়া খেলাম একপ্রস্থ। ভিতরটা উন্মুখ হয়ে উঠল।

হেসে একটা চোখ একটু ছোট করে জয়ন্ত বলল, কত হবে বল তো তোমার ঝুমরির বয়স এখন? কম করে বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ না? কিন্তু এখনো বেশ মাইরী! আগের থেকে সামান্য মোটা হয়েছে, গায়ের রং এখন ফর্সাই বলতে পারো, এক পিঠ খোলা চুল, ইচ্ছে করলে এখনো সেই আগের মতো হাসতে পারে—তাকাতেও পারে।

শ্লেষের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, হরিদ্বারে কি করছে—জপ-তপ আর প্রায়শ্চিত্ত।

—তাই তো বলল। আমি খোঁজ নিতে দিব্বি হেসে জবাব দিলে সব খুইয়ে আমার মতো মেয়েরা শেষে কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন বা হরিদ্বার ছাড়া আর কোথায় এসে ঠেকবে?

কিন্তু খুব একটা প্রায়শ্চিত্তও করছে বলে জয়ন্তর মনে হয়নি। রসিকতার মেজাজটি এখনো নাকি দিব্বি আছে।

……জয়ন্ত রঙ্গর সঙ্গে সুলক্ষণা দয়ালের দেখা হয়েছিল বিকেলের হর-কী-পিয়ারী ঘাটে। সকালের দিকে সেখানে পুণ্যার্থীদের চিড়ে-চ্যাপ্টা ভিড়, বিকেলের দিকে হাওয়া বিলাসীদের। জয়ন্ত রঙ্গ চুপচাপ দাঁড়িয়ে গঙ্গার শোভা দেখছিল, ছেলে-ছোকরাদের শিকল ধরে গঙ্গায় হুটোপুটি খাওয়া দেখছিল। কোত্থেকে একজন মহিলা পাশে এসে রাজ্যের বিস্ময় গলায় ঢেলে জিজ্ঞাসা করল ও মা—রঙ্গ সাহেব না?

তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ চিনেছে, কারণ চেহারায় শুধু বয়সের প্রসন্ন ছোঁয়া লেগেছে একটু—কিছুই খোয়া যায়নি।

অনেক কাল বাদে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে যেমন হয় তেমনি আনন্দ সুলক্ষণার। জয়ন্তকে ঘাট থেকে একটা নিরিবিলি দিকে টেনে নিয়ে গেছে। গঙ্গার ধারে দু'জনে পাশাপাশি বসেছে। নিজের প্রসঙ্গে প্রায় কোনো কথাই বলেনি বা বলতে চায়নি। জয়ন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করলে মুখ টিপে হেসেছে, আর শেষ বয়সে তাদের মতো মেয়েদের যে এ-সব জায়গাতে আশ্রয়—সেই কথাই বলেছে। কিন্তু সেই বলার মধ্যেও কোনো পরিতাপ ছিল না।

জয়ন্ত ঠাট্টা করেছে, শেষ বয়েস বলে তো একটুও মনে হচ্ছে না তোমাকে দেখে?

জবাবে হেসে ভ্রূকুটি করেছে সুলক্ষণা। বলেছে, এখনো তোমার চোখের দোষ। রোষো, নিজের এই চুলের বোঝা ছেটে ফেলব ভাবছি, তাহলে তোমাদের আর অসুবিধে হবে না।

নিজের কথা কিছু না বললেও বিশেষ করে আমার কথা নাকি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে সুলক্ষণা। কৃষ্ণকুমারের নামও মুখে আনেনি। এই থেকেই বোঝা গেছে সে-যে নেই সেটা ও জানে। জয়ন্ত বলল, তুমি লিখে নাম-টাম করেছ শুনে সুলক্ষণা যেমন অবাক তেমনি খুশী। তোমার বউয়ের কথা আর ছেলেপুলের কথা শুনতে চাইল—আমি আর কতটুকু জানি যে বলব।

আবার দেখা করার জন্য জয়ন্ত রঙ্গ তার হরিদ্বারের আস্তানার হদিস পেতে চেয়েছিল। ঘুরিয়ে সে আবেদন নাকচ করেছে সুলক্ষণা। তরল জবাব দিয়েছে, ঠিকানা আর কোথায়, ঠিকানাই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি। যদি থাকো তো এই হর-কী-পিয়ারীর ঘাটেই দেখা হবে আবার।

আরো তিন দিন হরিদ্বারে ছিল জয়ন্ত রঙ্গ। তিন দিনই ঘাটে এসে ঘণ্টা-দুঘণ্টা করে অপেক্ষা করেছে। সুলক্ষণা দয়াল আর আসেনি। আর দেখা হয়নি।

জয়ন্ত রঙ্গ চলে যাবার পর এক মাস কেটে গেছে। স্বাভাবিক-ভাবেই সুলক্ষণা দয়ালের কথা আবার ভুলেছি। এক মাস বাদে, হঠাৎ দিল্লীতে একটু কাজ পড়ে গেল আমার। আর দু'দিনের মধ্যে সে-কাজও শেষ হয়ে গেল। আমার ফিরতি টিকিটের তারিখে পৌঁছুতে মাঝে পাঁচটা দিন বাকী এখনো। এই পাঁচ-পাঁচটা দিন কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। দিল্লী আমার কাছে প্রায় কলকাতার মতোই পুরনো।

রাতের নিরিবিলিতে হঠাৎ সুলক্ষণা দয়ালের কথা মনে পড়ে গেল। আবার দেখা হওয়াটা ভবিতব্য ছিল বলেই হয়তো মনে পড়ল। ছেলেবেলার মতো এখন আর সে-রকম ভাবপ্রবণ তাড়না কিছু থাকার কথা নয়—ছিলও না। তাছাড়া মনের যে আসন থেকে সেই মেয়ে সরে গিয়ে প্রবৃত্তির পাতালে ডুব দিয়েছে—তারপর সে হরিদ্বারেই থাকুক বা মথুরা বৃন্দাবন করে বেড়াক—সেই আসনে আর সে কোনদিন ফিরে আসবে না জানি। তবু তাকে আর একটি বার দেখার জন্য ভিতরটা কেমন উন্মুখ হয়ে উঠল।

দিল্লী থেকে সকালে হরিদ্বারের লাক্সারি বাস ছাড়ে। ভিড়ের সময় নয়, টিকিট পেলাম। বাস ন'টায় ছাড়ে, দুপুর আড়াইটে তিনটের মধ্যে হরিদ্বারে পৌঁছায়।

বাসে বসেও অনেকবার মনে হয়েছে নেমে যাই। ফিরে যাই।

বাইশ বছর আগের সব স্মৃতি বুকের তলায় আজও যে তেমনি তাজা আছে কে জানত? কেন যাচ্ছি? কি দেখতে যাচ্ছি? একদিন যেমন চেয়েছিলাম তেমনি করে কৃষ্ণকুমারের মৃত্যুটা সম্পূর্ণ করার অকরুণ লোভে? আবার মন বলল, রওনা হয়েছি যখন যাওয়াই যাক না, সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা যে হবেই তার কি মানে? জয়ন্ত রঙ্গর সঙ্গে আর তো দেখা হয় নি। সে-যে ইচ্ছে করেই ওকে নিজের বাড়ির হদিস দেয়নি বা আর এসে দেখাও করেনি তাতেও আমার মনের তলায় বিস্ময়ের আঁচর পড়েছে। প্রায়শ্চিত্তের তাগিদেই সে-যে হরিদ্বারে এসেছিল এই বা কে জোর দিয়ে বলতে পারে? প্রদীপের নিচেটাই তো অন্ধকার। পুণ্যস্থানে এ-যাবত পাপের মিছিলও আমি কম দেখিনি। দেখা হলে হবে নয়তো দিন দুই একটু বেড়িয়ে আবার ফেরা যাবে।

কিন্তু এ-ও জানি এ-সবই আমার নিজেকে ভোলানোর চিন্তা। নিজের বিবেক একটু পরিষ্কার রাখার তাড়না। নইলে ভিতরে ভিতরে ওকে দেখার একটু তাড়না যে ছিল সেটা মিথ্যে নয়।

হরিদ্বার আমার মোটামুটি চেনা জায়গা। চেনা বলতে বেড়াবার জায়গাগুলো আর স্নানের ঘাট-টাটগুলো চিনি। কিন্তু বাড়ির হদিস বা ঠিকানা জানা না থাকলেও সেখান থেকে এক রমনীকে খুঁজে বার করতে পারব এমন ভরসা ছিলই না। একটা হোটেলে আস্তানা নিয়েছিলাম। তারপর সকালে বিকেলে ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা হর-কী-পিয়ারীর ঘাটে হাজিরা দিচ্ছিলাম। প্রথম বিকেলটা কাটল, পরের দুটো দিনের সকাল বিকেলও কাটল। হর-কী-পিয়ারীর ঘাটে দুবেলা আমার দুটো চোখ অভদ্রের মতো মেয়েদের দিকে ধাওয়া করেছে। দেখা মিলল না। আর মিলবেও না ধরেই নিয়েছিলাম। কালকের দিনটা দেখে আবার দিল্লী ফেরার সংকল্প। আমার বাইরেটা মোটামুটি নির্লিপ্ত। সুলক্ষণার দেখা না পেয়ে খুব হতাশ হয়েছি, নিজের কাছে সেটা স্বীকার করতেও সংকোচ। জায়গাটা ভালো।

দেখা হলে আরও ভালো হত। হল না যখন কি আর যাবে। দু'বেলা ওই হর-কী-পিয়ারীর ঘাটও একটা দেখার জায়গা, বেড়ানোর জায়গা। দুপুরের রোদ চড়া না থাকলে এখানে তিন চার মাইল হেঁটে বেড়ানোর মধ্যেও আনন্দ আছে।

দেখাও হল। পরদিন নয়, এই বিকেলেই। ঘণ্টাখানেক ঘাটে পায়চারি করার পর নেমে সোজা একদিকে পা চালিয়ে দিয়েছিলাম। সেটা কোন দিক্ আমি জানি না। রাস্তাটা নির্জন। ফাঁকায় ফাঁকায় এক একটা ডেরা। হঠাৎ এক জায়গায় এসে পা দুটো মাটির সঙ্গে যেন আটকে গেল।

যে জায়গার কথা বলছি, ঘাট থেকে কম করে মাইল তিনেক দূরে। এখানে সন্ধ্যা নামে দেরিতে। সবে তখন বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। চারদিকে বাঁশের বেড়া দেওয়া ছোট একটা আঙিনা। তার এক-প্রান্তে একটা টালির দালান। তার সামনের প্রাঙ্গণে ঘাসের ওপর বসে আছে পাঁচ-ছ'টি রমণী। নিজেদের মধ্যে গল্প করছে, কেউ কেউ হাসছে। ঠিক তাদের পিছনেই দাওয়ার ওপর যে বসে, তাকেই আমি খুঁজছি, তার জন্যেই দিল্লী থেকে এখানে আসা।

বেড়ার বাইরে কোনো পুরুষ যদি দাঁড়িয়ে গিয়ে গুটিকতক মেয়েকে দেখতে থাকে, সেটা চোখে পড়তে সময় লাগে না বোধহয়। ঘাসের ওপর যারা বসেছিল, তাদের বয়স অনুমান বাইশ চব্বিশ থেকে চৌতিরিশ পঁয়তিরিশের মধ্যে। আর এখান থেকে অন্তত সকলকেই বেশ সুশ্রী মনে হল আমার। তারাই প্রথম দেখেছে আমাকে। কারণ, আমি যাকে দেখছি তার হাতে একখানা বই কি বাঁধানো খাতা বোঝা যাচ্ছিল না। তার দৃষ্টি সেদিকেই।

মেয়েগুলো নিজেদের মধ্যে হয়তো বলা-বলি করল কিছু। আগেও হাসছিল। আমাকে দেখার পরের হাসিটা ভিন্ন বিষয়গত কিনা জানি না। দুই একটি বয়স্কার বেশ বিরক্ত মুখও দেখলাম।

তাদেরই একজন মুখ ফিরিয়ে পিছনের দাওয়ায় বসা রমণীটিকে বলল হয়তো কিছু। কারণ বই বা খাতা থেকে তার দৃষ্টিটা এই বাঁশের ফটকের দিকে ঘুরল।

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে হল স্থির নিশ্চল কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠল। তারপর বেশ ধীরে সুস্থে এদিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আমি চেয়েই আছি। জয়ন্ত রঙ্গ খুব বাড়িয়ে বলেনি। সামান্য মোটার দিক ঘেঁষলেও শ্রী যেন আগের থেকেও বেড়েছে। ······ এক পিঠ খোলা চুল। তেলের সঙ্গে যোগ কম বলেই হয়তো লালচে দেখাচ্ছে একটু। গায়ের রংও আগের থেকে ফর্সাই মনে হয়। পরণে চওড়া হলদে ছাপা পাড়ের পাতলা সাদা শাড়ি। গায়ে মুগো রঙের ব্লাউস। হাতে কিছু কাঁচের চুড়ি।

···সেই সুলক্ষণা দয়াল এখন তাহলে এই। আসতে আসতে একবারও আমার দিক থেকে চোখ ফেরায়নি সে। আমিও না। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি। চোখেও। আগের মতো তীক্ষ্ণ নয় আদৌ। উল্টে কৌতুক মাখা।

সামনে এল। দেখল আর একবার। হাসল আবার একটু। দড়ি বাঁধা গেটটা খুলে দিয়ে ডাকল, এসো।

বাইশ বছর নয়, যেন কিছুদিন আগেই আমাকে দেখেছে সে। আজ আবার দেখল। এখন ভিতরে ডাকছে।

স্থান কাল ভুলে আমি ওর দিকেই চেয়ে আছি। ওকেই দেখছি। সবার আগে আমার মগজে যে চিন্তাটা ঘা দিয়েছে, নিজের অগোচরে এরই মধ্যে হয়তো তার জবাবও খুঁজছি। বিগত বাইশটা বছরের মধ্যে এই মেয়ের কতগুলো বছর পুরুষের অশুচি বাসনার সহচরী হয়ে কেটেছে জানি না। এখনো যেমনটি দেখছি, পুরুষের চোখে না পড়ার মতো নয়—ডাক পড়ে কিনা জানি না। কিন্তু কোনো ব্যাভিচারিণী মেয়ের চোখে মুখে হাসিতে এই প্রসন্নতা লেগে থাকে কি করে?

—কি হল, এসো ? ওই মেয়েগুলো ভাবছে কি ?

ভিতরে এলাম। তারপর পাশে পাশে টালি ঘরগুলোর দিকে এগোলাম। সুলক্ষণা হালকা হেসে বলল, তোমার সঙ্গে শিগগীরই একদিন দেখা হয়ে যাবে আমি ঠিক জানতাম।

—কি করে ?

—বাঃ, তোমার সঙ্গে জয়ন্তর দেখা হয়নি ?

মাথা নাড়লাম।—হয়েছে। কলকাতায়।

—সে তোমাকে আমার কথা বলেনি ?

—বলেছে। বলেছে, হর-কী-পিয়ারীর ঘাটে হঠাৎ সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কে সুলক্ষণা আমি হঠাৎ বুঝতেই পারিনি।

ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রু-ভঙ্গি করে তাকালো মুখের দিকে। —বা-ব্বাঃ তাহলে তুমি মস্ত একজনই হয়েছ বটে। তারপর কি করে বুঝলে ?

—ও যখন বলল, ঝুমরির সঙ্গে দেখা হয়েছে।

ইচ্ছে করেই আমাদের চলার গতি শিথিল। আবার সেই হাসিমাখা ভ্রু-ভঙ্গি।—ওই মেয়েদের সামনে তুমি আবার আমাকে ঝুমরি টুমরি ডেকে বোসো না যেন। ওদের কাছে আমি সুলক্ষণা দিদি।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম শুধু একবার। ও আবার ঘাড় ফিরিয়ে ফিক করে হেসে নিল একটু।—কি দেখলে ? সুলক্ষণা ডাকার মতো কিছু চোখে পড়ছে না বুঝি ?

মনে মনে বললাম, সবটাই সুলক্ষণা দেখছি—আর সেই জন্যেই অবাক লাগছে। মুখে বললাম, আমার সঙ্গে শিগগীরই দেখা হবে ভাবলে কি করে, জয়ন্তর মুখে তোমার কথা শুনে কলকাতা থেকে ছুটে আসব ধরে নিয়েছিলে ?

মাথা নেড়ে সুলক্ষণা জবাব দিল, অত ভাগ্যি ভাবিনি, তবে এদিকে এলে একবার খোঁজ-টোজ করবে আশা ছিল।

বললাম, তাই বা করব ভাবলে কি করে, জয়ন্তকে তো নিজের

বাড়ির হদিস দাওনি, হর-কী-পিয়ারীর ঘাটে আবার দেখা হবে বলেও আর সেদিকে মাড়াও নি। দেখা হতে পারে ভেবে আমিও ওই ঘাটে দুদিন দুবেলা করে হাজিরা দিয়েছি। কাল ফিরব, আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে দুচোখ বড় বড় করে তাকালো সুলক্ষণা। সেই চোখে হাসি উপচে পড়ছে। মুখে বিড়ম্বনার ছোঁয়া। —কি কাণ্ড! আমারই পোড়া কপাল, ইস্, দু-দুটো দিন এভাবে পণ্ড হয়ে গেল।… জয়ন্তর কাছে শুনে সত্যিই কি কলকাতা থেকে চলে এসেছ নাকি?

—না, দিল্লী থেকে, দিল্লীতে কাজে এসেছিলাম। একটু শ্লেষের লোভ সামলানো গেল না, বললাম, তা হঠাৎ জয়ন্তকে ওভাবে কাটতি দিলে কেন—লজ্জায় না ভয়ে?

হাসতে লাগল। ওই মেয়েদের কাছে পৌঁছানোর আগে একটু সময় নেবার জন্যেই হয়তো সামনের বাগান ঘুরে চলেছে। যেখানে ফুলবেশি ফুটে আছে, সেখানে দাঁড়াচ্ছেও দুই এক মিনিট করে। হাসিমুখে সাদাসাপটা জবাবও দিল। বলল, কাটান দিলাম, কারণ জয়ন্ত এখনো সেই আগের জয়ন্তই আছে মনে হল, আর আমি কেমন মেয়ে জানে বলেই কথার ফাঁকে ফাঁকে আমার মুখ থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে নিতেও ছাড়েনি—আর, বাড়ির সন্ধান পেলেও ওর হয়তো দুই-এক রাত আমার কাছে কটিয়ে যেতেও আপত্তি হত না।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় ভিতরটা রি-রি করে উঠল আমার। এই কথাগুলো এমন অনায়াস কৌতুকে বলতে পারল বলেই রাগ। দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম, দেখা তো হল, আজ চলি তাহলে?

দাঁড়িয়ে গিয়ে থমকে তাকালো আমার দিকে। তারপর তেমনি পলকা রসিকতার সুরেই পাল্টা জবাব দিল, যাবে যাও—অত ভয় দেখাচ্ছ কি? তারপরেই হেসে বলল, তোমাকে জয়ন্ত ভাবছি না, এসো—

এর পরেও আঘাত দেবার ইচ্ছেটাই প্রবল আমার। বললাম,

জয়ন্ত হলে বা জয়ন্ত ভাবলেই বা তোমার এমন কি সাংঘাতিক ক্ষতি আর আপত্তি?

আবারও দাঁড়িয়ে গেল? কয়েক পলকের জন্য সমস্ত মুখ লাল একটু। আমার মনে হলো কালো চোখের তারায় সেই আগের মতো আবার এক ঝলক বিদ্যুৎও ঝলসে উঠতে পারে। না তা উঠল না, একটু দেখে নিল শুধু। তারপর মুখ টিপে হেসে বলল, এই বাইশ বছর বাদেও তোমার ভয়ানক রাগ দেখছি আমার ওপর। কেন গো?

এবারে নিজেরই কানের কাছটা গরম ঠেকছে। সুলক্ষণা বলল, চলে এসো, ওই মেয়েগুলো কি ভাবছে ঠিক নেই—

তার সঙ্গ ধরে আবারও শ্লেষ মাখানো জবাব দিলাম, তোমার পুরনো কোনো প্রীতির পাত্র ভাবছে হয়তো।

হেসে ফেলল। মাথা দুলিয়ে জবাব দিল, তাহলে তো ঠিকই ভাবছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওই মেয়েরা কারা?

—আমার কাছেই থাকে, আর আমাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। বড় ভালো মেয়েগুলো। কিন্তু ওদের এক-একজনের কথা শুনলে তুমি হয়তো এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে সোজা কলকাতার গাড়িতে চেপে বসবে।

যা বোঝার এটুকু থেকেই বোঝা গেল।

আমরা সামনে আসতে মেয়েগুলো উঠে দাঁড়াল। তাদের ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্রটি অমন হাসিমুখে এতক্ষন ধরে কার সঙ্গে আড্ডিনা পাড়ি দিল, তলায় তলায় হয়তো সেই কৌতূহলও আছে।

সুলক্ষণা বলল, এই মেয়েরা, কাকে দেখে তোরা হাসাহাসি করছিলি। কলকাতার একজন নামকরা লেখক। বামুন মানুষ, প্রণাম কর।

আমার অস্বস্তির একশেষ। ওরা একে একে পা ছুঁয়ে প্রণাম

সারল। আমার দিকে চেয়ে সুলক্ষণা হেসে জিজ্ঞাসা করল, আমিও ঠুকব নাকি একটা ?

গম্ভীর মুখে আমি আঙুল দিয়ে নিজের পা দেখিয়ে দিলাম। ও ছদ্ম কোপে ফোঁস করে উঠল, উঃ! বয়ে গেছে—

আগন্তুক দেখে ভিতর থেকে আরো তিন-চারটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। খুব না হোক, এরাও মোটামুটি সুশ্রী। আর বয়েস বাইশ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে। আমি বাঙালী লেখক পরিচয় পেলেও আমার সঙ্গে তাদের সুলক্ষণা দিদিটির সম্পর্ক কি এরা জানে না। আর সুলক্ষণারও আর বেশি পরিচয় দেবার উৎসাহ দেখা গেল না। সকলের উদ্দেশেই সে বলল, চা কর, তোরাও খা আমাদেরও দে—এঁর জন্যে একটু খাবার টাবারও করিস। আমাদের আজ বাইরে কোন প্রোগ্রাম নেই তো ?

ওরা মাথা নাড়ল নেই।

—বাঁচা গেল। আমি এঁকে নিয়ে একটু ঘরে বসছি, সময় হলেই ডাকিস—

কিসের সময় হলে কেন ডাকবে বোঝা গেল না। দিনের আলো এখন শেষ প্রায়: টালির ঘরগুলোতে আলো জ্বালা হয়েছে। একটি পরিচারিকা ঘরে ঘরে লণ্ঠন রেখে যাচ্ছে দেখলাম।

আমাকে নিয়ে সুলক্ষণা দাওয়ার সামনের ঘরটাতেই ঢুকে পড়ল। পাশাপাশি একই সাইজের চারটে ঘর। তারপর শেষের দিকে আর একটা বড় হল ঘরের মতো। টালির ছাদ হলেও ঘরের মেঝে সিমেণ্টের, আর ইট-সুরকির দেয়াল। পরিষ্কার তকতকে ঘর। দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারে গোপালের মূর্তি। কোণের দিকে একটা নেয়াড়ের খাটিয়া পাতা। তাতে পরিচ্ছন্ন সাদাসিধে শয্যা বিছানো। আলনায় খানদুই শাড়ি আর জামা ঝুলছে। এদিকের দেওয়ালে একটা আয়না টাঙানো।

কোথাও এতটুকু আতিশয্য নেই। এ-রকম একটা ঘরে এসে

দাঁড়ালে ভিতরটা আপনা থেকে খুশী হয় !

সুলক্ষণা জানালো, এটা তার ঘর। এতগুলো মেয়ের মধ্যে শুধু তারই একলার একখানা ঘর। অন্য ঘরগুলোর এক-একটায় তিন চারটে করে মেয়ে থাকে।

রসিকতা করে বললাম, প্রমিলা রাজ্যে এসে গেলাম মনে হচ্ছে।

হেসে মাথা নেড়ে সুলক্ষণা সায় দিল। সমস্ত বাড়িতে পুরুষও একজন আছেন—তিনি গোপাল। আর দ্বিতীর পুরুষ তুমি এলে।

বললাম, গোপালের হাত হিংস্র হবে না ?

—একটু হলেই বা, সে-ও তো খুব সুবিধের পুরুষ নয়। হাসিমুখে একটা আসন টেনে নিয়ে ও থমকালো একটু তারপর হেসে আসনটা আবার যথাস্থানে রাখতে রাখতে বলল, যাকগে, তুমি ওই বিছানাতেই বোসো—গোপালের আর একটু বেশি হিংসে হোক।

আমিও ঠাট্টা করলাম, ঠাকুর দেবতার হিংসে কুড়িয়ে কাজ কি।

—আচ্ছা তুমি বোসো তো, ঠাকুর দেবতা আমি মেয়েটা কেমন ভালো করেই চেনে।

শয্যার একধারে বসলাম। একটা ভাঁজ করা কম্বলের ওপর চাদর বিছানো। নিজেকে নিয়েও অনায়াসে যে ইঙ্গিত করল, সেটুকুর জন্যেই আমার বাইশ বছরের ক্রোধ আর পরিতাপ। অথচ আশ্চর্য, সব জানা থাকা সত্ত্বেও সুলক্ষণার দিকে চেয়ে আমার বার বার মনে হচ্ছিল, একটা শুচিতা যেন ওকে ঘিরে আছে।

ও সামনে এসে দাঁড়াল। চাউনিটা গভীর একটু।

—কি দেখছ ?

—তোমাকে। সেই বাইশ বছর আগের মতোই কাঁচা কাঁচা লাগছে। বিয়ে করেছ শুনেছি—বউ কেমন ?

হেসে জবাব দিলাম, বিয়ে তো সেই কোন্ যুগে করেছি—এখন আর কেমন-এর কি আছে।

চোখ পাকালো।—তার মানে বউ পুরনো হয়ে গেছে? হাসলও সঙ্গে সঙ্গে—ছেলে মেয়ে পড়ছে?

মাথা নাড়লাম।

ও ছেলেমানুষের মতোই বলে উঠল, আমার ছুটে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করছে।

—চলো না।

—ইস্, কি পরিচয় দেবে?

—বলব, তোদের অদেখা অনেককাল আগের এক হারানো মাসি।

হেসে উঠে লঘু সুরে সুলক্ষণা বলল, কেন পিসি বলবে না?

বাইশ বছরের সঠিক ইতিবৃত্ত কিছুই জানি না। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যেই আমার ভালো লাগছে, হালকা লাগছে। মাথা নাড়লাম, নাঃ অতটা নীরস হতে পারব না।

সুলক্ষণা হাসছে। চেয়ে আছে। বললাম, বোসো—

তেমনি চেয়ে থেকেই রসিকতা করল, এক্ষুণি চা দিতে আসবে, তুমি ওখানে বসে আছ দেখেই অবাক হবে, পাশে আমাকে দেখলে তো কথাই নেই। সামনে দাঁড়িয়েই ভালো লাগছে। জয়ন্ত বলছিল, অনেক নাকি বই-টই লিখছ?

—লিখেছি।

—কি বই?

—গল্প, উপন্যাস।

টিপ্পনীর সুরে একটু বিস্ময় প্রকাশ করল সুলক্ষণা, তোমার মধ্যে এত রস আছে জানতাম না।···তুই একখানা পাঠাও না, এককালে তো আমাকে বাংলা শেখানোর কি ঝোঁক ছিল তোমার—ঠেকে ঠেকে ঠিক পড়ে নিতে পারব।

—হিন্দী অনুবাদও আছে, তাই পাঠাব, ঠেকে ঠেকে পড়তে হবে না।

সুলক্ষণা ছেলেমানুষের মতোই খুশী হয়ে উঠল। মুখে বলল, তুমি এখান থেকে বেরিয়েই ভুলে যাবে। বাইশ বছরের মধ্যে একদিনও আমার কথা মনে পড়েছে ?

—তোমার পড়েছে ?

—আমার। হুঃ, তাহলে তো খুব উপন্যাস লেখো তুমি। কি মনে হতেই আবার হাসি—আমার গল্প লিখবে না ?

বললাম, তুমি সদয় হলেই লিখতে পারি।

ছদ্ম ভয়ে দু চোখ বড় করে ফেলল একটু, সদয় হলে মানে ? কি করতে হবে ?

—মাঝের বাইশটা বছরের ফারাক জুড়তে হবে, অর্থাৎ বাইশ বছরের খবর সব বলতে হবে।

সুলক্ষণা বলল, না শুনেই তো ঘেন্নায় চলে যেতে চাইছিলে, শুনলে তো এ নাম আর মুখেও আনবে না—কলম ধরা তো দূরের কথা।

সেই বিরূপ অনুভূতিটা এরই মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল কি করে ভেবে পাচ্ছিলাম না। এখন থেকে থেকে কেন যেন কেবলই মনে হচ্ছে শোনার মতো অনেক কথা আছে, আর শুনলে পর কলমও ধরা যাবে। গম্ভীর বক্তৃতার সুরে বললাম, লেখক হিসেবে আমি ভালো-মন্দ সুন্দর-কুৎসিত সব দেখি আর শুনি, শেষে তাই থেকেই জীবন-সোনা ঝালিয়ে তুলি।

সুলক্ষণা তেমনি চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখতে লাগল। তারপর বলল, ও বাবা ! থাক, এটুকু শুনেই আমি ঘাবড়ে যাচ্ছি।

চায়ের ট্রে হাতে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। দু পেয়ালা চা, একটা ডিশে কিছু ঘরের তৈরী খাবার। একটা কাগজ পেতে দিয়ে সেই ট্রেও শয্যার ওপরেই রাখতে বলল সুলক্ষণা। এটুকুও ব্যতিক্রম মনে হল আমার। কারণ, মেয়েটির মুখে বিস্ময়মাখা সম্ভ্রম দেখলাম।

মেয়েটি চলে যেতে সুলক্ষণা ট্রে থেকে নিজের পেয়ালাটা শুধু তুলে নিল। বললাম, আর কিছু নেবে না?

—নাঃ, তোমার খাতিরে চা খাচ্ছি, নইলে এ-সময় কিছুই চলে না। তুমি খাও—

একটু বাদে হালকা সুরে জিজ্ঞাসা করল, জয়ন্ত আমার কথা আর কি বলেছে তোমাকে?

—বলেছে, বয়েস হলেও এখনো বেশ মাইরি, চোখ ফেরানো যায় না।

হাসতে গিয়ে চা আটকে বিষম খেল সুলক্ষণা। তারপর আধা খাওয়া পেয়ালা ঘরের কোণে সরিয়ে রাখতে রাখতে হেসেই রাগ দেখালো, বরাবর ওটা পাজির পা-ঝাড়া একটা—

আমি নরম প্রতিবাদ করলাম, কেন খুব মিথ্যে তো বলেনি। হ্যাঁ, চাইলে ওর চোখে বাইশ বছর আগের সেই হাসি এখনো ঝিলিক দিয়ে উঠতে পারে বটে। মুখে তরল ঝাঁঝালো সুরে বলল, দেখো, তুমি ওর সঙ্গে গলা মিলিও না বলছি।

খেতে খেতে নিরীহ প্রশ্ন ছুঁড়লাম, মেলালে ওর মতোই গলা ধাক্কা দেবে?

—ও মা, ওকে গলা ধাক্কা কখন দিলাম।

—বাড়ির হদিস দিলে না, আসবে বলে এলেও না—গলা ধাক্কা আর কাকে বলে?

ও হাসতে লাগল। তারপর বলল, নাঃ, তোমার সঙ্গে ওর মতো ব্যবহার করব না, হাজার হোক দুর্বলতা একটু ছিলই—

—কার ছিল, তোমার না আমার?

—তুমি বড় জেরা করো। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এখানে কোথায় উঠেছ?

বললাম। একটু ভেবে নিয়ে সুলক্ষণা বলল, লোভ হলেও এখানে তোমাকে থাকতে বলতে পারছি না, জানলে কত জনের চোখ

টাটাবে ঠিক নেই। তার থেকে দুপুরে আর রাতে এসে খাবে—বেশি দূর নয়, টাঙায় মিনিট দশেক লাগে।

—আমি তো কালই দিল্লী চলে যাচ্ছি।

যেন আমার ওপর এখনো জোর আছে, এমনি করে সুলক্ষণা বলল, কাল তুমি মোটেই যাচ্ছ না।

আপত্তি নেই খুব, কারণ সুলক্ষণার জীবনের মাঝের এই বাইশটা বছর নিয়ে এখন দুর্বার কৌতূহল আমার। এতগুলো মেয়ের মধ্যে ওকে ঠিক এই পরিবেশে না দেখলে এত আগ্রহ হত না হয়তো।

একটু বাদেই ওদিক থেকে শাঁখের আওয়াজ কানে এল। একটি মেয়ে সাঁজের ধূপধুনো দিয়ে গেল। তারপরেই খোল-করতালের আওয়াজ শুনলাম। সুলক্ষণা আমাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরুলো। শেষের বড় ঘরটায় এসে ঢুকলাম ওর সঙ্গে। সেখানে এ-মাথা ও-মাথা শতরঞ্জীর ওপর ফরাস পাতা। সেই ফরাসে এখন তিরিশ চল্লিশটি মেয়েছেলে বসে। বেশির ভাগই বয়স্কা আর বিধবা। ঘরের এক মাথায় মালা গলায় বেশ বড়সড় গোপাল মূর্তি। তার সামনে হারমোনিয়াম, তবলা খোল করতাল। সেখানে এখানকার অর্থাৎ এই ডেরার মেয়েরা বসে। তাদের সামনে বেশ সুন্দর একটা আসন পাতা।

আমাকে সামনের দিকে বসিয়ে সুলক্ষণা এগিয়ে গিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে গোপাল প্রণাম করল। কম করে তিন চার মিনিট মাথা ঠেকিয়ে পড়ে রইল সে। তারপর উঠে আস্তে আস্তে সেই খালি আসনটায় গিয়ে বসল।

গান শুরু হল। একখানা ভজন গান। মূল গায়িকা সুলক্ষণা। অন্য মেয়েরাও থেকে থেকে সুর মেলাচ্ছে, সুলক্ষণা থামলে তারা সেই বিরতিটুকু ভরাট করে রাখছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলল এই গান। না, এ-রকম গান আমি খুব বেশি শুনিনি। গলা বরাবরই মিষ্টি ছিল সুলক্ষণার। সেই গলা কত যে ভালো হয়েছে আরো,

কানে না শুনলে বিশ্বাস হত না। কিন্তু এই গানের গলা আর সুরই যেন সব নয়, সমষ্টিগত সত্তার নিবিড় যোগ না থাকলে এমন গান হয় না, এ-রকম পরিবেশ সৃষ্টি হয় না।

বাইরের মহিলারা সব উঠে উঠে গোপাল প্রণাম করে টাকা আধুলি সিকিটা ফেলে চলে যেতে লাগলেন।

আমি উঠে পায়ে পায়ে আবার সুলক্ষণার ঘরে এসে বসলাম। বাইশ বছর আগের সুলক্ষণার সঙ্গে একে যেন কিছুতে মেলাতে পারছিলাম না।

মিনিট পনের বাদে সুলক্ষণা ঘরে এল। চোখের মুখের সেই তন্ময় ভাবটুকু গেছে। হালকা সুরেই জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগল?

—বেশ।

ঠিক এইটুকু জবাব আশা করে নি হয়তো। মুখের দিকে চেয়ে রইল। ভিতরটা আমার হঠাৎই আবার কেন যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল জানি না। হয়তো, সুলক্ষণার বাইশ বছর আগের ঘরছাড়া, আর এই গোপাল চরণে আত্মসমর্পণ—এর কোনোটার সঙ্গেই আপোস নেই আমার।

বললাম, সবটুকুই ভক্তি না এর সঙ্গে জীবিকার যোগও আছে?

থমকে তাকালো মুখের দিকে। মনে হল বেদনার ছায়াও পড়ল একটু। জবাব দিল, জীবিকার ব্যবস্থা না থাকলে ভক্তি আসবে কোত্থেকে?

—কিন্তু এই দিয়েই তোমাদের এতগুলো মেয়ের দিন চলে যায়?

হয়তো এই প্রশ্নের তির্যক কটাক্ষ ছিল একটু। কিন্তু সুলক্ষণা দয়ালের একটা পরিবর্তন স্পষ্ট। আগের মতো সহজে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে না, ঝলসে ওঠে না, হয়তো বা অনেক নিগ্রহের পরে এই সংযম-টুকু আয়ত্ত করেছে। যাক, আমার কথার জবাবে ও যা বলল, সে-ও অবাক হবার মতোই। সপ্তাহে কম করে তিন চারদিন বাইরের

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গানের প্রোগ্রাম থাকে তাদের। হরিদ্বারে কোথাও না কোথাও সে-রকম অনুষ্ঠান লেগেই আছে। সবার আগে তাদেরই ডাক পড়ে। সুলক্ষণাদের বিশেষ কিছু দাবি দাওয়া নেই, যারা যেমন দেয়। এখন নাম হয়েছে বলে খুব কমও দেয় না কেউ। এমন কি হরিদ্বারের বাইরেও বহু জায়গায় গাইতে যেতে হয়। দিন বেশ ভালই চলে যায় তাদের, অভাব-টভাব নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, এই গানের দল তুমি কতদিন গড়েছ ?

একটু ভেবে নিয়ে ও বলল, তা প্রায় বছর নয় হবে।

এবারে আমি সত্যিই অবাক একটু। ন'বছর আগে হলে তখন তেত্রিশ চৌত্রিশ হবে ওর বয়েস। এখন যা দেখছি, সে-সময় নিশ্চয় ওর ভরা যৌবন, ভরা রূপ। সব ছেড়ে সেই সময় থেকে ও গোপাল আশ্রয় করেছে—এটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয় আদৌ। আমি চেয়ে আছি, ওর মুখ থেকেই সেই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা টেনে বার করতে চেষ্টা করছি। শেষে বলেই ফেললাম, ও বয়সে এ-রকম তো হবার কথা নয়, গোপাল এমন টানা টানলে, কি ব্যাপার ?

মুখের দিকে চেয়ে টিপ-টিপ হাসতে লাগল। তারপর বলল, গোপাল টানলে এমনিই হয়।···তখন ভর-ভরতি অবস্থা আমার, পায়ে করে পুরুষের মন মাড়িয়ে যেতেই আনন্দ, তারই মধ্যে কি কাণ্ড—একেবারে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিজের পায়ে মুখটা আচ্ছা করে ঘষে দিয়ে তবে ছাড়লে—ছাড়লেই বা বলছি কেন, এখনো এই দুষ্টুমিই চলছে।

শুনতে ভালো লাগছে, কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। আমি চেয়েই আছি।

আত্মস্থ হয়ে সুলক্ষণা বলল, অত ব্যস্ত কেন, সব শোনাব বলেই তো ধরে রেখেছি। রোসো, নিজের ভিতরটা আরো ভালো করে খুঁজে দেখে নিই আগে—

হেঁয়ালির মতো লাগল। ভিতরের তাগিদ সত্ত্বেও আর জোর

করলাম না। কি মনে হতে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার এই মেয়েদের পেলে কোথায় ?

নিঃসঙ্কোচে সুলক্ষণা দয়াল জবাব দিল, নিজে থেকেই এসেছে, আগে মাত্র একটি চেনা মেয়ে ছিল, এখন ওরা ন'জন···সবাই আমার মতো, কেউ নিজে ভুল করেছে, কাউকে বা জোর করে ভুল করানো হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, ওদের ভিতর-বার এখন গোপালের পায়ে ?

হেসে ফেলল।—তাই যাতে হয় আমি তো চেষ্টা করি, আর নেবার আগে যতটা পারি যাচাই বাছাই করে নিই। তবু গণ্ডগোল কি হয় না, এ পর্যন্ত দু' দুটো মেয়ে ফের আবার লোভে পড়ে এখান থেকে সরে গেছে—আর তোমাদের পুরুষের লোভও বলিহারি, ঠাকুর ঘরে থাকো আর যেখানেই থাকো, জাল ফেলার কামাই নেই। পুণ্যিস্থানে যেন আরো বেশি পাপের বাসা।

সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা হবার পরেও চার দিন চার রাত হরিদ্বারে ছিলাম। বলতে গেলে দু'বেলাই ওদের এখানে এসেছি। বাড়ির বাইরে দু'দিন গানের প্রোগ্রাম ছিল সেখানেও গেছি। এখানকার মেয়েরা আমাকে শুভার্থী আত্মীয় ভেবেছে। সুলক্ষণা তাদের কি বলেছে জানি না, কিন্তু আমার প্রতি তাদেরও কোন রকম পলকা কৌতূহল দেখি নি। অবিমিশ্র শ্রদ্ধাই দেখেছি।

ফাঁকে ফাঁকে অনেক কথা হয়েছে সুলক্ষণার সঙ্গে, কিন্তু একটি বারও সে এর মধ্যে কৃষ্ণকুমারের বা তাদের বাড়ির কারো নামও উচ্চারণ করে নি। ক্রমে আমারই ধৈর্য কমে আসছিল। ফাঁক পেলেই তাগিদ দিচ্ছি, বলবে বলেও তো কিছুই বললে না—এবার যেতে হচ্ছে আমাকে।

গতকালও বলেছিলাম। ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে একটু চেয়ে থেকে ঝাঁঝ দেখিয়েছে, আমি কি তোমাকে ধরে রেখেছি ?

বলেছিলাম, তা অবশ্য রাখো নি—

তেমনি করেই ও আবার বলেছিল, পুরুষের স্বভাবই ওই রকম, এতবড় দেবস্থানে এসেও নরকের কথা শোনার লোভ।

আমি হেসেই জবাব দিয়েছিলাম, নরকের কথা তো নয়, নরক থেকে ওঠার কথা। সেটা শোনার মধ্যে পুণ্যি আছে।

—ছাই আছে। ওঠা তো ভারি, এই যে তুমি চলে যাবেই, তোমার বাড়ি-ঘর স্ত্রী ছেলেমেয়ে আছে—অথচ তোমাকে সত্যি ধরে রাখতে ইচ্ছে করছে।

ছ'কান ভরে শোনার মতো কথা। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলাম, করলেই বা, এ ইচ্ছের মধ্যে তো নরক নেই।

···ওর চোখে মুখে যে সুন্দর হাসিটুকু দেখেছিলাম তাও ভোলার নয়।

আজ সকালে আবার বললাম, কাল সকালে আর না গেলেই নয় কাজের খুব ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে—রিজারভেশান পেলে সোজা এখান থেকে কলকাতাই চলে যাব।

সুলক্ষণা বলল, ঠিক আছে, নামগানের দৌলতে আমার একটু চেনা-জানা আছে, একেবারে অসম্ভব না হলে রিজারভেশান পেয়ে যাবে।

সন্ধ্যেয় রিজারভেশানের টিকিট আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, নিশ্চিন্ত।

আমিও হেসেই মাথা নাড়লাম।

এই রাতটুকুই প্রত্যাশা আমার। ছিলামও রাত প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত। কিন্তু এ-দিন দেখলাম একলা পাওয়াই ভার ওকে। মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত, আমার খাওয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত। কাল ট্রেনে আমার সঙ্গে কি-কি খাবার যাবে—মেয়েদের সেই নির্দেশও দিচ্ছে।

রাতে হোটেলে ফেরার মুখে ওকে কাছে দেখলাম না। একটি মেয়ে বলল, দিদি এইমাত্র তাঁর ঘরে গেলেন—

পায়ে পায়ে তার ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালাম। স্টীলের বাক্স খুলে ওদিক ফিরে কিছু একটা করছে ও।

—ঝুমরি···।

চমকে ফিরে তাকালো। তারপর হেসেই ফেলল। বলল, বাইশ বছর বাদে এ ডাক শুনে ভয়ানক চমকে গেছলাম।—চললে?

হ্যাঁ।

এগিয়ে এল। হাসছে তখনো। —ঠিক আছে। তোমার খাবার নিয়ে সকালে ঠিক সময় আমি স্টেশনে যাব'খন।

এসেছে। একলাই। ট্রেন ছাড়তে তখন আর মিনিট দশেক মাত্র বাকি। খাবারের পাত্রটা জায়গা মতো রেখে এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, জল কোথায়?

—আছে। বোসো তুমি। আমি ভাবলাম আর এলেই না।

কুপেতে তখন পর্যন্ত আমি একা। আমার হাত খানেক তফাতে বসে সুলক্ষণা বলল, তোমাদের তো ওই রকমই ভাবনার দৌড়।··· কলকাতায় পৌঁছে চিঠি দেবে তো?

—চিঠি দিলে জবাব পাব?

হাসি মুখেই মাথা নাড়ল, তা অবশ্য পাবে না। আচ্ছা, তোমাকেও চিঠি লিখতে হবে না, দেখা হল, এই ভালো। গোপালের দয়ায় নিরাপদে পৌঁছুবে জানিই তো।

ঘড়ি দেখলাম। আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি। অভিমানাহত সুরে বললাম, আমারই শেষ পর্যন্ত কিছু জানা হল না।

—হবে, হবে। হাতের ঝোলা খুলে বাদামী রংয়ের বড় খাম বার করল একটা। —তুমিও যেমন, এ-সব কথা মুখে বলা যায় নাকি! খামটা হাতে দেবার আগে থমকালো একবার। —কিন্তু একটা কথা, আমাকে নিয়ে কোথাও কিচ্ছু লিখবে না।

—কেন?

লিখলে তুমি ঠিক আমাকে বাড়াবে জানি। সব কবুল করতে

পেরে আমার মনে একটু শাস্তি এল—ব্যস, এর বেশি আর কিছু চাই নে। রাস্তায় যেতে যেতে পড়বে তারপর ছিঁড়ে কুঁচি কুঁচি করে জানালা দিয়ে ফেলে দেবে। ঠিক তো?

হাত বাড়িয়ে ওর হাত থেকে খামটা নিলাম। বললাম, সেটা না পড়া পর্যন্ত বলতে পারছি না—তবে বাড়াবো না, কথা দিলাম।

ঘড়ি ধরে গাড়ি ছেড়েছে। তার আগে সুলক্ষণা নেমে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছে। চলন্ত ট্রেন থেকে যে কয়েক সেকেণ্ড দেখা গেছে তাকে, দেখেছি। তারপর খাম খুলে বসেছি।

কথার খেলাপ করব না। বাড়ানোর ভয় আছে বলেই, সুলক্ষণা দয়াল যা লিখেছে সেইটুকু শুধু তুলে ধরছি।

বাঙালীবাবু, রাতে যাবার আগে তুমি ঝুমরি বলে ডাকলে, আমারও বাইশ বছর আগের প্রিয় নামে তোমাকে ডাকার সুবিধে হয়ে গেল। আমার মেয়েদের কাছে এ'কদিন তোমাকে বাঙালীবাবুই বলেছি, আর আমার নিজেরই দু'কান যেন ভরে গেছে।

তোমার অনেক জানতে চাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বড় নোংরা ব্যাপার সব। সাধকরা বলেন, পাপ ধুয়ে ফেলতে চাও তো পাপ স্বীকার করো। কিন্তু কার কাছে স্বীকার করব? ঘরের দেওয়ালের কাছে: তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তোমার জানার লোভ থেকে আমার জানানোর লোভটা কম ছিল না। কিন্তু দোহাই তোমার, সবটুকু পড়ার আগেই ঘেন্নায় ছিঁড়ে ফেলে দিও না।

···জীবনে প্রথম যে মানুষকে দেখলে আমার দুচোখে ঘৃণা ঠিকরতো, আর মাথায় খুন চাপতো, সে আমার বাবা। একদিন আমি এই বাবাকেই দুনিয়ার সেরা সুন্দর পুরুষ ভাবতাম। বাবা যখন গান বাজনা নিয়ে বসত, আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম আর ভাবতাম ও-রকম গানের আসরে কবে আমারও জায়গা হবে।

বাবা মদ খেত, তাও আমার কাছে খুব একটা দোষের কিছু নয়।

মা রাগ করত, আর আমি ভাবতাম মা-ইচ্ছে করে ঝগড়া বাধায়। আমার পনের বছর বয়সের সময় মায়ের শরীর একেবারেই ভেঙ্গে গেল। চড়া ডায়বেটিস। উঠতে বসতে মাথা ঘোরে। একদিন বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। বাড়িতে কেউ নেই, উর্ধ্বশ্বাসে আমি ছুটলাম তুর্গা মাসির বাড়ি। বাবা সেখানে আড্ডা দিতে যায়। এই তুর্গামাসির সম্পর্কেও পাড়ার লোকে ভালো বলে না। তুর্গা মাসির কেন বিয়েই হল না, তাই নিয়েও এক-একজন এক-এক রকম বলে। কিন্তু ও-সবেও আমি কান দিই না। কারণ তুর্গা মাসি হাসে খুব, আমি গেলে আদর করে কাছে টেনে নেয়। ভালো ভালো খেতে দেয়।

বাড়ি থেকে পনের মিনিটের হাঁটা পথ এক ছুটে চলে এসেছি। বেদম হাপাচ্ছি। কিন্তু তুর্গা মাসির বাড়ি এসে মনে হল, কেউ নেই। তুটো ঘরই অন্ধকার। সামনের ঘরের দরজা খোলা, পিছনের অর্থাৎ তুর্গা মাসির ঘরের দরজা ভেজানো। ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে আলো জ্বাললাম।

তারপরে কয়েক পলকের জন্য যেন পাথর আমি। কি দেখলাম তা আর বলে কাজ নেই। ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলাম আবার। আরো দ্বিগুণ ছুটে সোজা বাড়ি। এর মধ্যে বিকেলের ঠিকা ঝি'টা এসেছিল। মাকে ওই অবস্থায় দেখে সেই পাড়ার লোক ডাকাডাকি করে তাকে ঘরে এনেছে।

আমি সে-ঘরেও আর থাকতে পারলাম না। বাইরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছি। সমস্ত পৃথিবীটা আমার কাছে একটা দগদগে ঘায়ের মতো বীভৎস লাগছে।

মিনিট কুড়ির মধ্যে বাবা এল। এসেই আমার গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল। এমন চড় আমি ঘুরে পড়ে গেলাম।

মা আর সে-যাত্রায় রক্ষা পেল না। তার তিন মাসের মধ্যে বিয়ে করে বাবা তুর্গা মাসিকে ঘরে নিয়ে এল। তুর্গা মাসি গোড়ায় গোড়ায় আমার মন পেতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাকে দেখলেই আমার তু-চোখে গল গল করে ঘৃণা ঠিকরতো ফলে বাবা আমাকে শাসন করত। তার ফলও উল্টো হত।

ভালবাসা ঠিক কাকে যে বলে আমি তখনো জানি না। শুনলে তুমি কানে আঙুল দেবে কিনা জানি না, আমার জীবনে প্রথম ভালবাসার মানুষ কৃষ্ণদাদা। ওই 'কাজিন' বিয়ে না কি বলে, আমাদের সমাজে সেটা চালু থাকলে যে করে হোক কৃষ্ণদাকে নিয়ে আমি পালাতাম, প্রাণ দিয়ে চিকিৎসা করতাম, তাকে ভালো করে তুলতাম। কৃষ্ণদাদার ঝাঁঝরা বুকের সঙ্গে নিজের বুকটা বদলাবদলি করা সম্ভব হলে তাও করতাম বোধহয়। আমার ভালবাসা কৃষ্ণদাকে শুধু সুস্থ করে তুলতে চেয়েছে, আর কিছু না। এই ভালবাসা কি পাপ?

কিন্তু এখানেও নিজের বাবার মতোই একজনকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করলাম। সে কৃষ্ণকুমারের বাবা। আমার পিসেমশাই। তার সেই বড় আদরের বন্ধু যজ্ঞেশ্বরবাবুকে নিশ্চয় মনে আছে তোমার?

বয়সে পিসেমশাইয়ের থেকে পাঁচ ছ'বছরের ছোট, পিসেমশাইকে দাদা-দাদা করত। পয়সা-অলা মানুষ, আমি এলাহাবাদে আসার আগেই তার বউ মরেছে শুনেছিলাম। তখন উনিশ পেরিয়ে সবে কুড়িতে পা দিয়েছি আমি, বোনকে একদিন আমাকে দেখাতে নিয়ে এল যজ্ঞেশ্বরবাবু। ওই বোনের ছেলে মস্ত সরকারী চাকুরে, তার বিয়ে দেওয়া হবে। ভালো মেয়ে চাই। দাবিদাওয়া নেই। পিসেমশাই আর পিসির অনুরোধ ঠেলতে না পেরে যজ্ঞেশ্বরবাবু বোনকে নিয়ে এল মেয়ে দেখাতে। মানে আমাকে দেখাতে। আমি জোর করে বলতে পারি সেই বোনের আমাকে পছন্দ হয়েছিল। নানাভাবে আমাকে যাচাই করে দেখে আর গান শুনে খুশীতে আটখানা হয়ে চলে গেছল। কিন্তু পরে গম্ভীরমুখে পিসেমশাই এসে খবর দিল তার নাকি মেয়ে পছন্দ হয়নি।

পছন্দ না হওয়ার কারণটা ছ'দিন না যেতেই বেশ বোঝা গেল। সন্ধ্যায় পিসেমশাই কেমন যেন চুপিচুপি এক জায়গায় যেতে হবে বলে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। রাস্তায় বলল যজ্ঞেশ্বরের শরীরটা ভালো না, তোর গান শোনার ইচ্ছে হয়েছে তাই—

তখনো সাদামনেই গেছি আমি। বিরাট চক-মিলানো দালান।

যজ্ঞেশ্বরবাবুর ঐশ্বর্যের কথা বলতে বলতে পিসেমশাই আমাকে তার কাছে নিয়ে গেল। যজ্ঞেশ্বরবাবুর ছেলে তিনটে কাছাকাছি ছিল, বড় ছেলেটা আমার থেকে বড় হবে বয়সে—সে আমাকে চোখ দিয়ে গিলতে গিলতে আর একদিকে চলে গেল।

যজ্ঞেশ্বরবাবুকে একটুও অসুস্থ মনে হল না আমার। দিব্বি হাসি-খুশি ফুর্তির মেজাজ। আমাকে আর পিসেমশাইকে একরাশ খেতে দিল। তারপর গান নিয়ে বসলাম। গাইতে গাইতে ওই লোকটার সঙ্গে বারকয়েক চোখাচোখি হতেই আমার মনে হল কিছু একটা গোল-মেলে ব্যাপারের মধ্যে পড়তে চলেছি। গান একটুও ভালো হল না। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরবাবু প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একে একে অনেকগুলো গান গাইয়ে ছাড়ল।

ফেরার সময় পিসেমশাই আমাকে খোলাখুলি যা বলল, তার সার কথা—যজ্ঞেশ্বরের মতো অত ভালো ভালো লোক আর হয় না, যেমন পয়সা তেমনি দরাজ মন। বয়েস একটু হয়েছে, তাও পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশের মধ্যে—ব্যাটাছেলের সেটা এমন কিছু বয়েস নয়। তার খুব পছন্দ তোকে, রানীর হালে থাকবি—মাথা ঠাণ্ডা করে ওকেই বিয়েটা করে ফেলা উচিত।

শোনার পর সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল আমার। জবাব না দিয়ে আমি শুধু মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ তা হবে না।

তাইতেই পিসেমশাই রেগে উঠল। আমার অবাধ্য হবি? আমি তোর ভালো বুঝি না?

আমাকে চুপ দেখে একরকম শাসিয়েই দিল তারপর। যা হবার পরে ভেবে চিন্তে হবে কিন্তু এ নিয়ে যেন বাড়ির কাউকে একটি কথাও না বলি।

তার ভয় কৃষ্ণদাকে। কিন্তু তাকেও কিছু বলতে পারা গেল না। বললে কতবড় অশান্তির সৃষ্টি হত জানি। আর তখন কৃষ্ণদার যা শরীরের হাল।

ক'দিন না যেতে পিসেমশাই আবার আর একদিন যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাড়ি নিয়ে যেতে চাইল। আমি গেলাম না। পিসেমশাই রাগে ফুঁসতে লাগল। এর একদিন পরেই যজ্ঞেশ্বরবাবু বাড়ি এসে হাজির।

পিসেমশাইও ঘটা করে তার আদর আপ্যায়ন করল। তারপর আমার ডাক পড়ল, গান শোনাতে হবে। কৃষ্ণদাই আমাকে ঠেলে পাঠালো, ভদ্রলোক এসেছেন বাড়ি বয়ে, গান শোনাবি না তো গান শিখিস কেন?

এক ঘন্টা ধরে গান হল। আর সেই একঘণ্টা ধরে দুই চোখ দিয়ে আমার শরীরটা যেন চেটেপুটে খেল যজ্ঞেশ্বরবাবু। চলে যাবার পর পিসেমশাই আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে প্রায় শাসিয়েই দিল, আমার অবাধ্যপনা বরদাস্ত করা হবে না, দুদিন আগে হোক পরে হোক বিয়ে ওখানেই হবে। তোর পিসিকেও আমি বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করিয়েছি—এর থেকে ভালো যে আর কিছু হয় না সেটা সে-ও বুঝেছে। আর তার শেষ কথা, ছেলে এখন অসুস্থ, তাকে যেন এখন এ-সব কথা শুনিয়ে একটুও বিরক্ত না করা হয়। আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে এটুকুই তার নির্দেশ।

আমি চারদিকে তখন অন্ধকার দেখছি। এর ওপর পরদিনই আবার কৃষ্ণদার গলগল করে রক্ত পড়ল গলা দিয়ে। আমার মনে হল কৃষ্ণদা দশ বিশ দিনের মধ্যেই চলে যাবে। তারপর? ওই পিসেমশাই আর ওই যজ্ঞেশ্বরের হাত থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে। বিশ্বেস করো বাঙালীবাবু, আমার তখন প্রথমেই তোমার কথা মনে হয়েছিল। তোমাকে ভাল লাগে, বাঁচার তাগিদে তোমাকে নিয়ে পালাতে আমার একটুও আপত্তি হত না। আর সেভাবে আঁকড়ে ধরতে পারলে তুমি আমাকে ছাড়তে পারতে না। কিন্তু তার পরেই মনে হল, তোমার অন্য রকম সমাজ, অন্য রকম পরিবার। আমার প্রতি তোমার একটু দুর্বলতা আছে বলে এমন একটা শাস্তি তোমার ওপর চাপিয়ে দেব! নিজের সমাজ সংসার থেকে বঞ্চিত হয়ে একদিন তুমিই কি আমাকে ঘৃণা করবে না?

তোমাকেও বাতিল করে দিলাম। তখন থাকল আর একজন। তার খবর তোমরা কেউ রাখো না। তার নাম কিশোর শেঠ। যে ওস্তাদের কাছে আমি গান শিখতাম, তারই আর এক শিষ্য। মাখন-খানার মতো চেহারা। দু-হাতের পাঁচ আঙ্গুলে পাঁচটা আংটি ঝকমক করত। জামায়ও হীরের বোতাম পরত। নিজের ঝকমকে একখানা

গাড়ি হাঁকিয়ে আসত সে। আমার সপ্তাহে যে দুদিন গান শেখার পালা, তার সেদিন আসার কথাও নয়। কিন্তু দু-চারবার দেখা হয়ে যাওয়ার পর ক্রমে দেখা গেল ওই দু-দিনই সে সব থেকে নিয়ম করে আসত। গুরুর কাছে আসবে, তালিম দেওয়া শুনবে—তাতে আর কার কি বলার আছে। তাছাড়া ওই ওস্তাদের মতো ভালো মানুষও কম হয়।

কিশোর শেঠ কেন যে আসত আমিই শুধু ভালো বুঝতাম। এক-একদিন গাড়ি নিয়ে সে একটু দূরে অপেক্ষা করত। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইত। আমি তার সঙ্গে কথা বলতাম না, চোখ দিয়ে চাবকে অন্য দিকে ফিরে চলে আসতাম।

কলেজ যাবার সময়ও এক-একদিন তার গাড়ি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে যেত। গাড়িতে আমাকে কলেজে পৌঁছে দেবার জন্য অনুনয়ই করত। আমি ঝাঁঝিয়ে উঠতাম, ফের এ ভাবে আমার পিছু নিলে মুশকিল হবে। কিশোর শেঠ হাসত, বলত, তুমি নারাজ, এর থেকে মুশকিল আর কি হতে পারে?

বড়লোক শিষ্যকে গুরু যে একটু বেশী খাতির করতেন তা আমার নিজের চোখেই দেখা। সেখানে বলে কিছু সুবিধা হবে না। বাড়ীতে কৃষ্ণদার এই হাল। মাঝখান থেকে লোক জানাজানি হয়ে একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হবে। আমি রাগে ফুলতাম, কিন্তু সহ্যও করতে হত। লোকটারও মুণ্ডু যে ভালভাবেই ঘুরেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গুরুর বাড়ির আর কলেজ যাওয়ার পথ যে আকুতি নিয়ে গাড়িতে বসে থাকত, তাই দেখে সময় সময় হাসিও পেত। আমাকে একটু চোখের দেখা দেখতে পেলেও যেন জীবন ধন্য ওর।

আমার সেই সংকটের সময় ওর কথাই মনে এল আমার। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাঙচুরের নেশা যেন পেয়ে বসল আমাকে। এই করলে বাবার ওপর শোধ নেওয়া হবে, পিসেমশাইয়ের ওপরেও।

সেদিনও কলেজের পথে কিশোর শেঠের গাড়ি দাঁড়িয়ে দেখলাম। সোজা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে তার পাশে বসলাম। এ-রকম ভাগ্য ওর কল্পনার বাইরে। আনন্দে ডগমগ হয়ে জিজ্ঞাসা করল কলেজে তো?

—না। যেখানে খুশি।

হাওয়ায় ভেসে চলল কিশোর শেঠের গাড়ি। আমি সোজা ঘুরে বসলাম তার দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ঠিক ঠিক কি চাও বলো।

ও বলল, তোমাকে।

—বিয়ে করবে?

দম বন্ধ করে মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, করব।

—তোমাদের বাড়িতে আপত্তি হবে না?

মুখ কাচুমাচু করে ও বলল, তা একটু হবে হয়তো……।

—তাহলে?

ও প্রাণপণে এই তাহলের জবাব হাতড়ে বেড়াতে লাগল। আমিই রাস্তা দেখলাম, আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে?

ও লাফিয়ে উঠল। তক্ষুনি রাজি। আমি বললাম, আজ নয় সময়ে বলব। বাড়িতে বলে রেখো কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছ, নইলে তোমার বাড়ি থেকেও আবার খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। আর বেশ কিছুদিন চলার মাতো টাকা-কড়ি সঙ্গে নিও।

অত বলার দরকার ছিল না। ব্যবস্থা মত আমরা চলে এলাম বেনারসে। এক নাগাড়ে কোথাও বেশিদিন থাকতাম না। ইউ পি-র সর্বত্র প্রায় মাসখানেক ঘোরাঘুরি করে কাটল। কিশোর শেঠ আমার কেনা গোলাম যেন। যা বলি তাই শোনে। আমার একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দের জন্য দেদার খরচ করে। ওকে যতটুকু পাগল করা দরকার করেছি। বিকেল হতে না হতে রাতের প্রত্যাশায় বসে থাকত। কিন্তু বিয়ের কথা তুললেই ওর মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যেত। বলত, হবে, খুব শিগগীর হবে। তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

আমার সন্দেহ বাড়তে থাকল। শেষে জেরার ফলে একদিন ধরা পড়ে গেল। দু-বছর আগেই ওর বিয়ে হয়ে গেছে। ঘরে বউ আছে। হাঁটু গেড়ে আমার পা-দুটো জড়িয়ে ধরে ওর সে-কি আকুতি। বিয়ে করলেও আমিই ওর ধ্যান জ্ঞান, আমিই সব। বিয়ে ও আমাকে ঠিকই করবে, কিন্তু তার আগে সব দিক গুছিয়ে

নেবার জন্য ওর কিছু সময় দরকার।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙেছে। ওর বুকে একটা ধারালো ছোরা বসিয়ে দিতে পারলে মন ঠাণ্ডা হত। সেই রাতে আমার শয্যার দিকে ওকে ঘেঁষতে দিলাম না। সমস্ত রাত বসে ভাবলাম। একদিন ওই কিশোর শেঠ আমাকে ছেড়ে চলে যাবে ঠিক জানি। কিন্তু তার আগে ওকে অবলম্বন করেই আমাকে দাঁড়াতে হবে, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা দূর করতে হবে। এটুকু যদি না পারি, আমার রূপ যৌবন চোখের আগুন সব মিথ্যা।

পরদিনই আবার ওকে কাছে টেনে নিলাম। খুব হাসলাম। খুব আদর করলাম। বললাম, তুমি এত ছেলেমানুষ আমি জানতাম না, প্রথমেই সব আমাকে খুলে বললে পারতে—সত্যিকারের ভালবাসার মানুষকে ওটুকুর জন্যে কেউ কি ফেলে দিতে পারে, না কি সত্যিকারের ভালবাসার সমাজ-সংস্কারের পরোয়া করে ?

কিশোর শেঠ বর্তে গেল।

আমি আরো নিশ্চিন্ত করে দিলাম তাকে। বললাম, যাকগে, বিয়ের ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি তোমার প্রেয়সী হয়েই থাকব—কিন্তু তুমি আমাকে তোমার রুচির যোগ্য করে তোলো, এই যৌবনের ফুল শুধু তোমার জন্যেই যেন সম্পূর্ণ হয়ে ফুটতে পারে সেই ব্যবস্থা করো।

ব্যবস্থাটা কি প্রথমে বোঝেনি, পরে বোঝার পর আনন্দে আত্মহারা হয়েছে। হবে না কেন, টাকারতো অঢেল জোর। ওকে নিয়ে আমি লক্ষ্ণৌ চলে এসেছি। সেখানে অনেক খরচ করে গুণী ওস্তাদ রেখে আবার গান বাজনার তালিম নিতে শুরু করেছি। নাচ ও বাদ দিই নি। নামী বাঈজীর কাছে সহবৎ শিক্ষা করেছি। না, বোকার মতো কিশোর শেঠকে আমি সেখানে আটকে রাখিনি। সে তারই ইচ্ছে মতো বাড়িতে গেছে এসেছে। যখনই এসেছে দু'পকেট বোঝাই টাকা এনেছে। আমি অম্লান বদনে সে-টাকা নিজের দখলে রেখেছি, আর প্রতিবারের থেকে প্রত্যেক বারে বেশি প্রেমের অভিনয় করেছি। ওকে পাগল করাটাই আমার লক্ষ্য। পাগল করেছি।

খুব বেশি সময় লাগে নি। গলা তো অনেকটা তৈরিই ছিল, বছর চারেকের মধ্যেই আমাকে নিয়ে টানাটানি পড়তে লাগল। আমার রূপ যৌবন কটাক্ষ সবই কাজ করত, ফলে টাকাও বেশি পেতাম। নাচ গান তো আছেই, আরো প্রত্যাশায় টাকার মানুষেরা পায়ে এসে গড়াগড়ি খেত। প্রাপ্যগণ্ডা মনের মতো হলে তাদেরও করুণা করতে আমার আপত্তি হত না। আমার ভিতরে সেই থেকেই শুধু ধ্বংসের আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে নিজেকে পোড়ানোই আর মত্ত উল্লাসে পুরুষ পোড়ানোর একমাত্র লক্ষ্য। সে-সময়ে যদি তোমার দেখা পেতাম বাঙালী বাবু, তাহলে তোমারও কি সর্বনাশ যে হত কে জানে। কৃষ্ণদা অনেক আগেই মারা গেছে সে-খবর কিশোর শেঠ আমাকে এনে দিয়েছিল। আমার কাছে দুনিয়ার বাকি সব পুরুষ নরকের জীব। তারা যত বেশি জ্বলবে আমার ততো উল্লাস।

এর পর আমার প্রথম কাজ কিশোর শেঠকে ছিবড়ের মতো বাতিল করা। আমার আশা ছেড়ে তাকেও একদিন জ্বলতে জ্বলতে ঘরে ফিরতে হয়েছে। আমার ব্যাঙ্কের জমা টাকা বাড়ছেই, অলঙ্কারের ঐশ্বর্যও বাড়ছেই। পুরনো হয়ে যাবার ভয়ে খুব বেশিদিন কাউকে আমি এক নাগাড়ে ধরে রাখি না। ফলে নতুন নতুন মানুষের ধর্ণা দেওয়া আর মাথা খোঁড়ারও বিরাম নেই।

এবাবে নিশ্চয় ঘৃণায় শিউরে উঠছ বাঙালী বাবু। আরো একটু বাকি—শোনো। তখন আমার বয়েস বত্রিশ পেরিয়েছে। অর্থাৎ এলাহাবাদ ছাড়ার পর তের চৌদ্দ বছর কেটে গেছে। কিন্তু পুরুষ তখনো আমাকে নিয়ে এমনি মত্ত যে বয়েস দেখার চোখ কারো নেই। এদিক থেকে ভগবানের কিছু মাত্র কার্পণ্য ছিল না বলে বয়েস চোখে পড়ার কারণ ও নেই। সেবারে এক ধনীর দুলালের সঙ্গে এসেছি মধ্যপ্রদেশের কোনো এক জায়গায়। টাকার অঙ্ক সে-রকম হলে তাতেই বা আপত্তি কি? এ-রকম কত সময় কত জায়গায় গেছি, ঠিক নেই।

জঙ্গলের মধ্যেই মাঝারি আকারের একটা ডাক-বাংলো। ফূর্তির জায়গা হিসেবে আমার সঙ্গী সেই বাংলোটাই বেছে নিয়েছে। বাংলোয়

আমি আর সে ছাড়া আর যে লোকটার অবস্থান, মানুষ না বলে তাকেও জানোয়ারই বলা চলে। বছর সাঁইতিরিশ আটতিরিশ হয়তো বয়েস, পা থেকে গলা পর্যন্ত গরম কম্বল জড়ানো, মাথার চুল পিছন দিকে পিঠে এসে নেমেছে, আর গাল বোঝাই দাড়ি বুকের দিকে। গায়ের আর চুল দাড়ির রং মিলেমিশে একাকার। এখানে আসার পর এমনি হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়েছিল যেন জীবনে আর কখনো মেয়েছেলে দেখেনি। আমার সঙ্গী ধমকে উঠতে তবে সে আত্মস্থ হয়েছে।

লোকটা এই বাংলোর চৌকিদার।

আমরা বিকেলের দিকে এসেছি। দিন দুই থাকার ইচ্ছে। সন্ধ্যা নামতেই সঙ্গী মদের গেলাস নিয়ে বসেছে। ওরা যতো মদ গেলে আমার ততো সুবিধে। হামলা হুজ্জোত কম হয়। ওকে সঙ্গ দেবার জন্য আমিও গেলাস নিয়ে বসেছি। আর খাচ্ছিও একটু বেশিই। সেই সঙ্গে গুন্ গুন্ করে রসের গানও গেয়ে উঠছি। এক এক বার উঠে নাচার চেষ্টাও করছি।

রাত তখন ন'টা দশটার বেশি নয়। কিন্তু এখানে তখন নিঝুম রাত। খাওয়া দাওয়ার পরে আবার এক-প্রস্থ মদ গিলল লোকটা। তারপর আমার দিকে এগলো। ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে। আমার ঘুম পাচ্ছে। কতক্ষণে অব্যাহতি পাব ভাবছি।

হঠাৎ ঠাস করে ঘরের ভেজানো দরজা দুটো খুলে গেল। কেউ যেন প্রচণ্ড এক লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলল। ঘরে এসে দাঁড়াল যমদূতের মতো সেই চৌকিদার। জন্তুর মতোই জ্বলছে তার দুটো চোখ। গায়ের কম্বল ফেলে এগিয়ে এসে আমার বুকের ওপর থেকে সঙ্গীকে যেন ছোঁ মেরে টেনে তুলে নিয়েই এক আছাড়। লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। আমি কাঠ। যমদূতের মতো ওই চৌকিদার আবারও এগিয়ে গেল তার দিকে, আবারও টেনে শূন্যে তুলে নিল। তারপর তাকে নিয়ে চোখের পলকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি কাঁপছি থরথর করে। কি চায় লোকটা? কি মতলব ওর? একে একে দুজনকেই খুন করবে আমাদের?

একটু বাদেই মোটর স্টার্ট দেবার শব্দ কানে এলো। কি হল? আমাকে রেখে সঙ্গীকে গাড়িসুদ্ধ তাড়িয়ে দিল। ওই শীতেও আমি ঘামছি। শয্যায় উঠে বসে কাঁপছি।

সাক্ষাৎ যমের মতো ওই চৌকিদার ফিরল আবার। আমার দু হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে অপলক চেয়ে রইল। এখন আর ওই দুটো চোখ জানোয়ারের মতো জ্বলছে না। তার বদলে গলগল করে যেন ঘৃণা ঠিকরোচ্ছে। সেই ঘৃণা আমার চোখে মুখে ঝাপটা মেরে যাচ্ছে।

কিন্তু এরকম অপলক চাউনি আমি আর কি দেখেছি। কার দেখেছি? কবে দেখেছি? কোথায় দেখেছি? এ কাকে দেখছি আমি? আমার সামনে দাঁড়িয়ে এ কে?

লোকটা নিজের মোটা ময়লা জামার পকেটে হাত ঢোকালো। কি যেন বার করল। তারপর সেটা আমার সামনে, সজোরে আমার বিছানার ওপর আছড়ে ফেলল।

জিনিসটা চিকচিক করে উঠল। দু চোখ বিস্ফারিত করে আমি দেখলাম একটা হার। আমার মায়ের দেওয়া সেই চুরি-যাওয়া হার।

মুখ তুলে দেখলাম, লোকটা ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

এবারে চিনলাম। সেই মধু। সেই মধু যাদব।

...তারপর থেকে বাঙালীবাবু, তুমি যা দেখলে আমি তাই। এক বছর বাদে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলের সেই বাংলোয় আর একবার গেছলাম মধুর খোঁজে। সে নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না। আমি এখনো গান গাই আর গোপাল পুজো করি। আমার গোপালের মুখ আর মধুর মুখ আজও মাঝে মাঝে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সে-ও কি পাপ?

আমি জানি না।